পতিতপাবনী বিশ্বজননীর সম্বন্ধ বুঝাবার জন্য। শিশুর এই দৃশ্য তাঁহারই অভয় বাণী।

৩। মা ভাল কাপড় চোপড় পরাইয়া সন্তানকে স্কুলে পাঠান, সে কালি-ধূলা মেখে, কাপড় ছিঁড়ে বাড়ী আসে। মা জল দিয়ে, গামছা দিয়ে সব ধুয়ে দেন। আঁচল দিয়ে তাহার গা পুছান, এবং সময়ে সময়ে একটু ভর্ৎসনাও করেন। ইহাই পাপীর ভরসা। মা স্বহস্তে তাহার পাপ-কালি ধূলা ধুয়ে দেন।

বারানসীতত্ত্ব।

পঞ্চম অধ্যায়।

নদীসম্মুখস্থ কোতয়ালী।

কোতয়ালী-মহল্লার প্রথমেই রামঘাট। এখানে সোপানোপরি একটি মন্দির আছে, তাহাতে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ইহাদিগের মধ্যে কাহারও চক্ষু, কাহারও বা বদন বৃহৎ এবং কেহ কেহ হস্তপদহীন। মূর্ত্তিগুলি দেখিতে কুৎসিত। এই দেবমূর্ত্তিগুলির পরিধানে সোনালি রঙ্গের বস্ত্র। চৈত্রমাসে রামনবমীর সময় এই ঘাটে বহু লোক স্নান করিয়া থাকে। প্রাতঃকালে ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী ও পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই এই ঘাটে স্নান করিয়া রামচন্দ্রের পূজা করিয়া থাকে। এই স্থানে বদমায়েসেরা ভদ্রমহিলাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া থাকে। সুতরাং হিন্দু-মহিলাগণ এখানে আসিয়া সাবধানে থাকিবেন। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক ঘাট আছে, যথা মঙ্গলা, গৌরী এবং দলপত ঘাট। ইহার পরেই পঞ্চগঙ্গা ঘাট। এই ঘাটটী পঞ্চতীর্থের মধ্যে একটী তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। হিন্দুগণ এই ঘাটকে পবিত্র বলিয়া ভক্তি করেন, কারণ তাহা-দিগের বিশ্বাস এই যে, এই স্থানে গঙ্গার সহিত অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতীচতুষ্টয় যথা—ধূতপাপ, করীণনদী, যমুনা নদ এবং সরস্বতী—আসিয়া মিলিত হইয়াছে। প্রবাদ এই যে, ধোরতপাপ নামে এক কুমারী ছিলেন। তিনি ক্রোধপরবশ হইয়া স্বীয় ভাবী পতিকে ধর্ম্মনদে পরিণত করেন। তাঁহার স্বামীও প্রতিহিংসালোলুপ হইয়া তাঁহাকে এক পাহাড়ে পরিবর্ত্তিত করেন। পরন্তু কুমারীর পিতা বেদাসুর কৃপাপরবশ হইয়া স্বীয় কন্যাকে চন্দ্রকান্ত নামক প্রস্তরবিশেষে পরিণত করেন। চন্দ্র-কিরণে চন্দ্রকান্তর প্রস্তর বিগলিত হইয়া নদীতে পরিণত হয়। এই নদী ধর্ম্ম-পত্নী। কিরণ নদী সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, সূর্য্যদেব যখন মঙ্গলগৌরীর পূজায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁহার ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া নদীতে পরিণত হয়। এই নদীই কিরণ নদী নামে খ্যাত। ঘাটটী প্রশস্ত এবং

তাহার মধ্যে যে সকল গম্বুজ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটী এক একটী দেবালয়। ঘাটের উপরে লক্ষ্মণবালা নামে একটী বৃহৎ অট্টালিকা আছে। এখানে ভক্তবৃন্দ সমাগত হইয়া মালা জপ করেন। গীতবাদ্যও বাদ যায় না। ঘাটের নিম্নদেশে কল্লোলিনীর কলনাদ এবং উপরে মনোমুগ্ধকারী তানলয়-সমন্বিত সঙ্গীত কর্ণকুহরে পীযূষ বর্ষণ করিয়া থাকে। মন্দিরের ভিতর ত্রিমূর্ত্তি এক সারে বিরাজিত। মধ্যস্থিত মূর্ত্তির নীল পরিচ্ছদ, মস্তকে নীল বর্ণের পাকড়ি, এবং গলদেশে মালা দোদুল্যমান। ইঁহার বাম দিকে গিল্টি করা একটি চক্র দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহাতে নাক, কান, মুখ এবং চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়। ইটি সূর্য্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটি চক্র আছে, তাহা চন্দ্রদেবের প্রতিনিধি। মূর্ত্তির সমক্ষে একটি দীপ জ্বলিয়া থাকে। ভক্তগণ এখানে সমাগত হইয়া পূজা করিয়া থাকেন। ঘাটের উত্তরপূর্ব্ব দিকে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের একটি মস্‌জিদ আছে, তাহা অধুনা মাধোদাসের দেওয়া নামে খ্যাত। মস্‌জিদটীর অত্যন্ত পাকা গাঁথুনি। ইহাতে শিল্পকার্য্যের কারিকুরি না থাকিলও উপরিভাগটী দেখিবার বস্তু। ইহার চূড়া ১৪২ ফিট উচ্চে অবস্থিত। প্রথমে উহা আরও ৫০ ফিট উচ্চ ছিল, পরন্তু ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কায় প্রিন্সেপ্‌ সাহেব তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলান। এখনও উহা ১৪ ইঞ্চি হেলিয়া আছে। এই মস্‌জিদে মুসলমানগণ কম যান। ঔরঙ্গজেবের নিযুক্ত মোল্লার অনেক বংশধর এই মস্‌জিদের মালিক। মস্‌জিদের সংস্কার ইংরাজরাজই করিয়া থাকেন এবং ইহার ব্যয় সরবরাহের জন্য পুরাকাল হইতে একটি গ্রাম নির্দ্দিষ্ট আছে। পঞ্চগঙ্গা ঘাটের পরই প্রাসিদ্ধিহীন লাল সীতলা ঘাট, লাল ঘাট এবং গাইঘাট।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

নদীসম্মুখস্থ আদমপুরা।

প্রথমে যে শত-মহল্লার কথা বলা হইয়াছে, তাহার পরই নদীর সমক্ষে যে অবশিষ্ট অংশ আমাদিগের নয়নপথে পতিত হয়, তাহার নাম আদমপুরা। ইহা পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানে ঘাটের সংখ্যা কম এবং তাহাদিগের প্রাসিদ্ধিও নাই। প্রথমেই মহারাষ্ট্রীয়-রাজকুমারী বালা বাইয়ের ঘাট এবং ইহার অনতিদূরে ত্রিলোচন ঘাট। শেষোক্ত ঘাটটীতে ত্রিলোচন-দেবের মন্দির অবস্থিত। এই হেতুই ঘাটের নাম ত্রিলোচন ঘাট হইয়াছে। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী রাজকুমারী নাথুবালা। প্রবাদ এই যে, যখন মহাদেব ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন বিষ্ণু সহস্র প্রকারের ফুল লইয়া আসিয়া তাঁহার পূজা করিতেন। একদা বিষ্ণু-পূজার জন্য ফুল লইয়া আসিয়া রাখিয়াছেন, দৈবযোগে তাঁহার দৃষ্টি কোন বস্তুর উপর আকৃষ্ট হইল। এই অবকাশে মহাদেব

একটি ফুল হরণ করিয়া লইলেন। বিষ্ণু পুনরায় পূর্ব্ববৎ পূজা করিতে লাগিলেন এবং গণিয়া গণিয়া ফুল অর্পণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখনই দেখিলেন যে তাঁহার একটি ফুল কমিতেছে, তখন তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি নিজের একটি লোচন উৎপাটিত করিয়া অর্পণ করিলেন। অমনি মহাদেবের মূর্ত্তিতে চক্ষুটী লাগিয়া গেল। তখন মহাদেব ঘটনা-স্রোত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তদবধি তাঁহার ত্রিনেত্র হইল। দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, শিবলিঙ্গ সপ্তপাতাল প্রদাক্ষিণ করিয়া এই স্থানে আসিয়া অবস্থিত হইল। গৌরী মহাদেবের অন্বেষণে ফিরিতেছিলেন। মহাদেব স্বীয় তৃতীয় চক্ষুদ্বারা গৌরীকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। লোকের বিশ্বাস এই যে, উক্ত মন্দিরের নিকট গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর ত্রিবেণীসঙ্গম হইয়াছে। অধিকন্তু সরস্বতীশ্বর, যমুনেশ্বর এবং নর্ম্মদেশ্বর—এই তিনটি দেবতা এখানে অবস্থিতি করেন। প্রথম মূর্ত্তিদ্বয় এখানে অবস্থিত, পরন্তু শেষোক্ত দেবতার মন্দির কিছু দূরে। বৈশাখ মাসে যে ব্যক্তি ত্রিলোচন দেবের মন্দিরে একদিন দিবা-রাত্র পূজা করে, সে মুক্ত হইয়া যায়। দেওয়ালে গদাকৃতি একটি দেবতা বিরাজ করিতেছেন, তিনি উচ্চে তিন ফিট এবং তাঁহার ব্যাস এক ফুট। ইনি কোটী-লিঙ্গেশ্বর নামে খ্যাত। দক্ষিণপশ্চিম কোণে একটি অশ্বথ বৃক্ষ আছে, তাঁহার নীচে হনুমানের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটেই গণেশ এবং শীতলার মূর্ত্তি দেওয়ালে সংলগ্ন রহিয়াছে। দক্ষিণে বারাণসী নামে একটি দেবতা দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা বনার ইহাঁর প্রতিষ্ঠাতা। গণেশ এবং সূর্য্যদেবেরও মূর্ত্তি এখানে আছে, পরন্তু ইহাঁদিগের বিগ্রহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র।

ত্রিলোচনের মন্দিরের ছাত আটটী স্তম্ভের উপর স্থাপিত। মন্দিরটী ছবি দ্বারা সজ্জিত। মন্দিরের দ্বারের বিপরীত দিকে শ্বেতপ্রস্তরের একটী সাঁড় শুইয়া আছে। উপরে দুইটী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। পূজান্তে লোকেরা এই ঘণ্টা বাজাইয়া থাকে। মন্দিরে গণেশদেবের মূর্ত্তি শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত। নারায়ণ এবং লক্ষ্মী-দেবীর মূর্ত্তিও সেখানে বিরাজমান। মন্দিরাভ্যন্তরে লিঙ্গেশ্বর এবং পার্ব্বতীর মূর্ত্তি আছে, ইহাদিগের সমক্ষে দীপ প্রজ্জলিত থাকে।

ত্রিলোচনঘাটের অপর একটি নাম পিলপিল তীর্থ। জলনিমজ্জিত দুইটি গম্বুজের মধ্যে লোকে স্নান করিয়া থাকে। এই ঘাটই শেষ ঘাট বলিয়া পরিগণিত। এতদতিরিক্ত মধুঘাট, তিলিয়া নালা ঘাট এবং প্রহ্লাদ ঘাট নামে তিনটি ঘাট আছে, পরন্তু তথায় লোকসমাগম অত্যন্ত অল্প।

গাইঘাটের সন্নিকটে নির্ম্মদেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরটী শিল্পকার্য্য-বিহীন।

দ্বিতীয় মন্দিরটীর নাম আদি মহাদেব। এখানে ব্যাসমঞ্চ আছে, কথকতাও হইয়া থাকে। এখানে পার্ব্বতীশ্বরীর একটী মূর্ত্তি বিরাজমান। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, গোরজীনামক জনৈক ব্রাহ্মণ পার্ব্বতীশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় কাশীখণ্ড পাঠ করিয়া লুপ্ত-দেবদেবীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন।

ডফরিণ সেতুর নিকটে রাজঘাট। কিন্তু এ ঘাটটী স্নানের জন্য নহে। উক্ত সেতুনির্ম্মাণের পূর্ব্বে নৌকারোহিগণকে এই স্থানে নামিতে হইত। এই স্থানে যে ডাকবাঙ্গালা দেখা যায়, তাহা চুঙ্গি অফিস্ ছিল। এই স্থানে নৌকারোহিগণকে মাসুল দিতে হইত। সেতুর উচ্চ তটে রাজা বনারের নির্ম্মিত বহু পুরাতন রাজঘাটগড় আছে। সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইহা নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয়, কিন্তু ইহাতে সেনা থাকিত না। ইহার পরের তটটী গঙ্গা এবং বরুণা সঙ্গমের সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। এই স্থানে কতকগুলি ভগ্ন অট্টালিকা অবস্থিত। বরুণাসঙ্গম অতি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত। এখানেও একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। স্নানের নিমিত্ত যে স্নানপঙ্ক আছে, তন্মধ্যে ইহাই অন্তিম স্থান এবং পঞ্চকোশী তীর্থের একটি অংশ মাত্র। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী দেবী।

বর্ত্তমান বঙ্গীয় মহিলাসমাজের শিক্ষা—তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও বিস্তারের প্রকৃষ্ট উপায়।*

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪) বিলাসিতা—আমরা পাশ্চাত্য-দেশবাসিগণের গুণগুলি অনুকরণ করিতে পারি আর না পারি, অন্যান্য বিষয়ে অনায়াসেই তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া থাকি। আমরা এরূপ ভাবে অনুকরণ করি যে, সেগুলি আর সহজে পরিত্যাগ করিতে পারি না।

আমাদিগের ভারত পূর্ব্বে কর্ম্মপ্রবণতার

* এই প্রবন্ধ-সম্বন্ধে পাঠকগণের মতামত এবং যে যে বিষয়ের সহিত তাঁহাদের মতের মিল না হয় তাহার প্রতিবাদ পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব। শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এজন্য এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। বা, বো, স।

আধারভূত ছিল। আর্য্য রমণীগণ ঐহিক সুখের জন্য, বাহ্যিক পারিপাট্যের জন্য এবং বেশ ভূষার জন্য লালায়িত ছিলেন না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য-সভ্যতালোক-প্রাপ্ত বঙ্গ-রমণীগণ বিলাসিতার গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছেন। তাঁহাদিগের আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বিলাসিতাই দেশের অবনতির মূল। বিলাসিতার দ্বারা দেশ-বাসিগণ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। বিলাসিতা হইতেই ক্রমে ক্রমে আলস্যের উদ্ভব হয়। ইহা দেশের উন্নতির কণ্টকস্বরূপ। কেহ হয়ত বলিবেন যে, পাশ্চাত্যদেশীয়গণত বিলাসী, তবে তাহারা এত উন্নত কেন? ইহার উত্তর—পাশ্চাত্যদেশবাসিগণ যে পরিমাণে বিলাসী, তাহারা ততোধিক পরিমাণে কর্ম্মপ্রবণ। আমরাও যদি তাহাদিগের ন্যায় কর্ম্মপ্রবণ হইতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদিগের ন্যায় উন্নত হইতে পারিব। কিন্তু কর্ম্ম প্রবণতারদিকে আমরা অন্ধ, অনুচিকীর্ষু বাঙ্গালীর সে দিকে দৃষ্টি নাই, তাহারা দোষ গুণ বিচার না করিয়া কেবল অনুকরণই করে। যাহা হউক, আমাদিগের বিলাসিতা পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

(৫) গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম ও আলস্য—বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ শিক্ষিতা মহিলা গৃহকর্ম্মে অবহেলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা যেন গৃহ-কর্ম্মগুলিকে অতি নিকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া মনে করেন। পূর্ব্বকার লোকেরা স্ত্রীলোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন—"দ্রৌপদীর ন্যায় রন্ধন কার্য্যে পারদর্শিনী হও।" এখন যদি কেহ ঐ আশীর্ব্বাদ করে, তাহা হইলে, লোকে তাহাকে "Old fool" বলিবে। এক্ষণে প্রায় অনেক বাটীতেই পাচক ব্রাহ্মণ আছে। যদি কোন বিশেষ কারণে, ঐ পাচক ব্রাহ্মণ একদিন অনুপস্থিত হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিতা মহিলার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত পতিত হয়।

মনু বলিয়াছেন—

"সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া॥"

ইহার অর্থ—স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বদা হৃষ্টান্তঃ-করণে গৃহকর্ম্মে দক্ষতা প্রকাশ করিবেন। তাঁহারা গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন ও পরিমিত-ব্যয়শীল হইবেন।

মনু গৃহকর্ম্ম হৃষ্টান্তঃকরণে করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু গৃহকর্ম্মের নাম শ্রবণেই এখন অনেক রমণীর হৃদয়ে বিষাদের আবির্ভাব হয়। আর বিলাসিনী হইলে কিছুতেই মিতব্যয়শীল হওয়া যায় না। বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ মহিলার কার্য্যের মধ্যে দেখা যায়, ইজি চেয়ারে অথবা সোফাতে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় নভেল-নাটক পাঠ করা, কিম্বা উল লইয়া বয়ন করা। কাহারও বা অত্যধিক মস্তিষ্ক চালনায় ঘন ঘন হিষ্টিরিক্ ফিট্ হইতে দেখা যায়। বর্ত্তমান কালের মহিলাগণ কোন প্রকার ব্যায়াম করেন না বলিয়া তাঁহাদিগের এই সকল ব্যাধি হইয়া থাকে। ফুট্ বল্, ব্যাট্ বল্, টেনিস্, হকি, পোলো,

প্রভৃতি ক্রীড়া অথবা ডাম্বেল-ভাঁজা ভিন্ন যে ব্যায়াম হয় না, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আমাদিগের গৃহকর্ম্ম-গুলি করিলেই যথেষ্ট ব্যায়াম করা হয় এবং এইরূপ ব্যায়ামই স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ উপযুক্ত।

(৬) আদর্শ—আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান কালের কোন মহিলা যদি পরোপকারব্রতধারিণী হন, তাহা হইলে তিনি কুমারী নাইটীঙ্গেলকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিবেন কেন? আমাদিগের পুরাণ ইতিহাসে কি কোন আদর্শ চিত্র অঙ্কিত নাই? আদর্শস্থানীয় করিতে হইলে, আমাদিগের দেশের স্বদেশপ্রাণা পরদুঃখমোচনচেষ্টিতা, কোন প্রাচীন কালের রমণীকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইবে,—পাশ্চাত্য দেশের নহে। পাশ্চাত্যদেশের আদর্শকে শত চেষ্টা করিলেও আমরা আমাদের করিয়া লইতে পারিব না। আমাদিগের আদর্শ আমাদিগেরই উপযুক্ত।

আমরা এতক্ষণ কেবল বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষা-প্রণালীর দোষই আলোচনা করিলাম। বর্ত্তমান-স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালীর গুণ যে কিছুই নাই, তাহা নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ইংরাজ-শাসনের পূর্ব্বে দেশে যে পরিমাণে অশিক্ষিতা রমণী ছিলেন, এক্ষণে আর তত নাই,—ইহাই আমাদের পরম আনন্দের বিষয়। তবে বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার সহিত বর্ত্তমান পুরুষদিগের শিক্ষার বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই। স্ত্রীলোকেরা প্রায় পুরুষদিগের ন্যায়ই শিক্ষিতা হইতেছেন। এইজন্য তাঁহারা পুরুষদিগের জীবন-সংগ্রামের সঙ্গিনী হইতে পারেন। ইহাও একপক্ষে কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। বর্ত্তমান-শিক্ষাপ্রণালী যে উচ্চাঙ্গের, তাহাতে বিন্দু-মাত্র সন্দেহ নাই। তবে আমাদের মতে যাহা যাহা দূষণীয় বলিয়া বোধ হয়, তাহাই অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

আদর্শ শিক্ষা ও তাহার বিস্তারের উপায়।

এক্ষণে দেখা প্রয়োজন যে, কিরূপ প্রণালীতে শিক্ষা প্রদত্ত হইলে তাহা "আদর্শ শিক্ষা" বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অবশ্য এক এক দেশের, এক এক ধর্ম্মা-বলম্বীর, এক এক সমাজের আদর্শ এক এক প্রকার। মূলতঃ সকলেরই এক উদ্দেশ্য। তবে আমাদের বঙ্গদেশের প্রণালী বঙ্গের ন্যায়ই হওয়া উচিত। বঙ্গের আদর্শ একমাত্র বঙ্গই হওয়া উচিত। যে শিক্ষা দ্বারা জাতীয় উন্নতি, ধর্ম্মজীবন ও গার্হস্থ্য-জীবন সুচারুরূপে গঠিত হইতে পারে, সুখের হইতে পারে, তাহাই প্রকৃত আদর্শ-শিক্ষা।

১। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যা-লয় স্থাপন—প্রত্যেক পল্লীতে এক একটী করিয়া স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যা-লয় স্থাপন করিতে হইবে। পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যত অর্থব্যয় হয়, আমাদিগের ভারতে তদ্রূপ অর্থব্যয় হয় না। সম্প্রতি বরোদার গায়োকবার নিয়ম

করিয়াছেন যে, ১৫ জন পাঠার্থী বালক বা বালিকা একটী গ্রামে থাকিলেই তথায় একটী স্কুল খুলিতে পারিবে। তাহার অধিকাংশ ব্যয়ভারও গায়কোবার স্বয়ং বহন করিবেন। আমাদিগের দেশে যদি ঐরূপ নিয়ম প্রচলিত হয়, তাহা হইলে অচিরে প্রভূত মঙ্গল হইবে। আমাদিগের মতে বিনা বেতনে সাধারণ লোকের পুত্র কন্যাকে বিদ্যাদান করা কর্ত্তব্য, এবং বৎসরান্তে উৎসাহ প্রদর্শনার্থ তাহাদিগকে পুস্তক ও নানাবিধ দ্রব্যাদি পারিতোষিক প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক গ্রামে এক বা ততোধিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। এক গ্রামের অধিবাসিনীগণ শিক্ষিত হইবেন, আর অপরগ্রামবাসিনীগণ অশিক্ষিত থাকিবেন, ইহা হইতেই পারে না। বিদ্যালয়গুলি আকারে ছোট হয়, তাহাতে কিছু দোষ নাই, কিন্তু সংখ্যায় অত্যধিক হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে যদি কোনও গ্রামের অধিবাসিগণ সমবেত-চেষ্টার দ্বারা একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নানা কারণে বিশেষ বেগ পাইতে হয়।

যাহা হউক, প্রত্যেক নগরে এক একটি করিয়া বড় বিদ্যালয় থাকিবে। জেলা বড় হইলে, প্রত্যেক দশ বারটি গ্রাম লইয়া এক একটি বড় বিদ্যালয় গঠিত হইবে। এ গুলির উপর ইউনিভার্সীটি বা শাখা ইউনিভারসিটী থাকিবে।

হিন্দু সমাজের অনেকে বালিকাদিগকে বা গৃহিনীদিগকে স্কুলে পাঠাইতে ইচ্ছা করেন না বা তাঁহাদিগকে পাঠাইবার সুযোগ হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রেও শিক্ষা প্রচার করা আবশ্যক, এইজন্য অন্তঃপুর-শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে। অর্থাৎ অন্তঃপুরচারিণীগণকে সুবিধামত তাঁহাদিগের বাটীতে গিয়া পড়াইয়া আসা এবং গল্পচ্ছলে নানা বিষয়ের উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। আমরা কি বিদ্যালয়ে, কি অন্তঃপুরে শিক্ষক অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রীর উপযোগিতা অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করি।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে আবশ্যক দ্রব্য-গুলিও রাখিতে হইবে। একটী নিত্য-আবশ্যক পুস্তকালয় প্রত্যেক স্কুলে রাখিতে হইবে। আর বরোদার গায়কোবার যেরূপ লাইব্রেরীর প্রচলন করিয়াছেন, সেইরূপ করিতে পারিলে অত্যন্ত উপকার হয়। তিনি চক্রযুক্ত দুই তিন শত গাড়ি প্রস্তুত করাইয়া, তাহাদের প্রত্যেকটী পাঁচ শত করিয়া উৎকৃষ্ট পুস্তকে পরিপূর্ণ করাইয়াছেন। প্রত্যেক গাড়িতেই পৃথক পৃথক পুস্তক। অর্থাৎ এক গাড়িতে যে পুস্তক আছে, অন্য গাড়িতে তাহা নাই। একখানি গাড়ি একটি গ্রামে আইসে এবং সেই স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে। সেই গ্রামবাসীদিগের সেই পুস্তকগুলি পাঠ করা হইয়া যাইলে অপর গ্রামে সেই গাড়ী চলিয়া যায়। আবার নূতন গাড়ী সেই গ্রামে আইসে। এইরূপে সমগ্র দেশে বিদ্যার প্রচার হয়।

২। পাঠের সময়—

সাধারণতঃ প্রাতে ও বৈকালে বিদ্যালয়ের কার্য্য হইবে। প্রাতঃকালে বালিকারা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে বিদ্যালয়ে যাইবে। ৬॥০ ঘটিকা হইতে দশম ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ অভ্যাস করিবে। তাহার পর গৃহে গমন করিয়া স্নানাহার করিবে। আহারের পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পূর্ব্বদিন শিক্ষয়িত্রী যে হস্তলিপি, চিত্র ও সীবন-কার্য্য শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার অনুশীলন করিবে। আবার চারি ঘটিকার সময় বিদ্যালয়ে গমন করিয়া ছয় ঘটিকার সময়ে বাটীতে ফিরিয়া আসিবে। প্রয়োজন হইলে রাত্রিতে ম্যাজিক-লণ্ঠন দ্বারা নানা প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে। অথবা গল্পচ্ছলে বালিকাগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

৩। বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়—

কাব্যাদি সহিত।

- বঙ্গভাষা ও তাহার ব্যাকরণ।
- সংস্কৃত-ভাষা ও তাহার ব্যাকরণ।
- ইংরাজী ভাষা ও তাহার ব্যাকরণ।

বঙ্গভাষায় বিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস।
„ „ „ ভূগোল।
„ „ প্রত্যেক মহাদেশের পৃথক পৃথক ইতিহাস।
„ „ প্রত্যেক মহাদেশের পৃথক পৃথক ভূগোল।
„ সংক্ষিপ্ত পৃথিবীর ইতিহাস।

বঙ্গভাষায় সংক্ষিপ্ত পৃথিবীর ভূগোল।

সংক্ষিপ্ত

- বিজ্ঞান (যত প্রকার আছে)।
- দর্শন (দেশীয় ও বিদেশীয়)।
- চিকিৎসা শাস্ত্র (দেশীয় ও বিদেশীয়)।

অঙ্ক শাস্ত্র—ব্যবসায় ও বাণিজ্য—রাজনীতি—অর্থনীতি—ধর্ম্মনীতি—সমাজনীতি—প্রত্ন-তত্ত্ব—ভাষা-তত্ত্ব—ভূতত্ত্ব—খগোল প্রভৃতি—ইঞ্জিনিয়ারিং—চিত্র শিল্প—কারুকার্য্য—সঙ্গীত—রন্ধন-প্রণালী—গৃহকার্য্য প্রভৃতি।

৪। পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচন—

শিক্ষা সম্বন্ধে সকল বিষয়েই গভর্ণমেণ্টের পরামর্শ লওয়া উচিত, তবে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা থাকাও প্রার্থনীয়। বর্ত্তমান সময়ে পাঠ্য-নির্ব্বাচক-সমিতি-কর্ত্তৃক যে সকল পুস্তক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, তাহা যথাযথ হয় না। দেশের স্বনামখ্যাত বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ দ্বারা পাঠ্য পুস্তক লেখাইয়া লওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এ কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের একখানি প্রকৃত ইতিহাস প্রণয়ন হইল না। অনেক সময় ইতিহাসে সত্য ঘটনা অপ্রকাশিত থাকে। আমাদিগের মতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব এরূপ ভাবে অপ্রকাশিত রাখা উচিত নহে।

৫। আলোচনা—(শিক্ষণীয় বিষয়-সম্বন্ধে)

অধিকাংশ পুস্তকই আমাদিগের মাতৃভাষায় লিখিত হওয়া প্রয়োজন, যেহেতু বিষয়-সমূহ যতই গুরুতর ও জটিল

হউক না কেন, মাতৃভাষায় লিখিত হইলে তাহা সহজেই বোধগম্য হয়, আর সাধারণ লোকেও নানা বিষয় জ্ঞাত হইতে পারে। প্রথমতঃ আমাদিগের মাতৃভাষা উত্তমরূপে জানা আবশ্যক, তাহার পর প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। ইংরাজী-ভাষা সকলেরই শিক্ষা করা অতীব প্রয়োজনীয়, যেহেতু ইংরাজী ভাষা রাজকীয় ভাষা এবং ভারতের নানা প্রদেশেও এই ভাষার বিস্তৃতি হইয়াছে। কেবল ভারত কেন, পৃথিবীর অনেক স্থানেই এই ভাষা প্রচলিত। এক কথায় বলিতে গেলে ইংরাজী ভাষাকে সর্ব্বজনীন ভাষা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। যাহা হউক, সর্ব্বসাধারণেরই ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে ও অনর্গল কথোপকথন করিতে পারা উচিত। ইতিহাস পাঠ করা আমাদিগের অতীব প্রয়োজনীয়, যেহেতু প্রাচীন ইতিহাস পাঠে, আমাদিগের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ হয়—তাহাতে আমাদিগের হৃদয় সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে। বৈদেশিক-ইতিহাস পাঠেরও প্রয়োজন আছে, কারণ সেই সকল দেশ কিরূপে উন্নতি ও অবনতির ঘাত প্রতিঘাতে স্থির থাকিয়া এইরূপ সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে তাহা জানিবার ও ভাবিবার বিষয়। বিজ্ঞান আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয়, বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ভিন্ন দেশের উন্নতি সম্ভবে না। পাশ্চাত্য-দেশের এত উন্নতির অন্যতম কারণ—বিজ্ঞানের অদম্য পুরুষানুক্রমিক অনুশীলন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ নিত্য নব নব বিষয় আবিষ্কার করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত ও বিস্মিত করিতেছেন। আমাদিগের দেশের প্রতিপল্লীতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার (laboratory) স্থাপিত হউক, তাহা হইলে আমাদিগের দেশবাসিগণও অনাবিষ্কৃত প্রয়োজনীয় বিষয়-সমূহ নিত্য আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিবে। চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধেও সকলের অল্প বিস্তর জ্ঞান থাকা উচিত। অন্ততঃ স্বাস্থ্যতত্ত্বের মূল সূত্রগুলি সকলেরই জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। অর্থনীতি, ব্যবসায় ও বাণিজ্যনীতি বিশেষভাবে অনুশীলন-যোগ্য। সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি অতি সরল ভাবে বক্তৃতাচ্ছলে শিক্ষা দিলে মন্দ হয় না। ইঞ্জিনীয়ারিং সকলেরই অল্প বিস্তর জানা আবশ্যক। রন্ধনপ্রণালী ও গৃহকার্য্য এমন কি "খুটীনাটী" কার্য্য পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ভারত পূর্ব্বে শিল্পগৌরবে গৌরবান্বিত ছিল, অদ্য তাহা বিলুপ্তপ্রায়, সেই জন্য সকলেরই কিছু কিছু শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করা প্রয়োজন। সঙ্গীতশাস্ত্রও কিছু অনুশীলন করা প্রয়োজন। সঙ্গীতের আলোচনায় মন প্রফুল্ল হয়। এই সমস্ত বিষয়ে যাহাতে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

মন্তব্য।

মহিলাগণের দয়া, মায়া, ভালবাসা

ইত্যাদি পুরুষদিগের অপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হয়। আমরা মহিলাদিগকে পুরুষদিগের ন্যায় শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি না। যাহাতে তাঁহাদিগের দয়া, সহৃদয়তা, ও কোমলতা প্রভৃতি গুণগুলি সমধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত ও বিকশিত হয়, তাহার চেষ্টা করা ও তাঁহাদিগকে সেই প্রকার শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য। মহিলাগণের প্রকৃতি যেমন পুরুষ হইতে ভিন্ন, সেইরূপ তাঁহাদিগের শিক্ষাও বিভিন্ন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। পুরুষজাতিকে পুরুষপ্রকৃতির শিক্ষা ও নারীজাতিকে নারী-স্বভাবোপযোগিনী শিক্ষা দান করাই জনসমাজের মঙ্গলের উপায়। ইহার অন্যথা করিলে সমাজ ও দেশের বিষম অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে। মহিলাগণ পুরুষপ্রকৃতি লাভ করিয়া লজ্জা, মধুরতা, সৌকুমার্য্য ও বিনয় প্রভৃতি গুণে ক্রমেই হীন হইয়া পড়িবেন। আমাদিগের মতে মহিলাগণকে বিভিন্ন প্রণালীর শিক্ষা প্রদান করা নিতান্তই আবশ্যক। তবে এরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত যে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে উভয়কে সাহায্য করিবে। রমণী-সুলভ সরলতা ইত্যাদির সহিত পুরুষের ন্যায় অন্যায় বিচার ইত্যাদি মিলিলে শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। সাধারণের উপকার হয়, সর্ব্বদা এরূপ শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য, যথা :—রন্ধন, সীবন, গৃহকার্য্য ইত্যাদি।

পূর্ব্বে আমরা বিদ্যাশিক্ষার সময় ও বিদ্যালয়ের গঠন সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি তাহা কোন কোন স্থলে কার্য্যতঃ হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারা যায় যে, বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথের 'বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" ও হরিদ্বারের "গুরুকুল সমাজ" অনেকটা এই প্রণালীতে শিক্ষা-দান করিতেছেন। এই সকল বিদ্যালয়ই অনেকটা আদর্শ বিদ্যালয় বলিয়া কথিত হইতে পারে। সরস্বতীর অবতার স্বরূপা শ্রীমতী সরলা দেবী যে, সমগ্র ভারতের জন্য স্ত্রী-শিক্ষামণ্ডল স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের মতের অনুকূল, তবে তাহা একেবারে ত্রুটি-বিচ্যুতি-পরিশূন্য নহে। তিনি যদি উহা হিন্দুদিগের উপযোগী করিয়া, ধর্ম্মশিক্ষার সহিত ঐ শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা হইলে সমগ্র দেশ-বাসীর মঙ্গল হইবে ও তাঁহার শিক্ষাসংঘ সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে।

পূর্ব্বকার অনেক লোকেই ধর্ম্মের জন্য বিদ্যালয়, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্য করিতেন। গভর্ণ-মেণ্টের সাহায্য ভিন্নও অনেক ধনবান্ ব্যক্তির সাহায্যে বিদ্যালয়ের কার্য্য হইত। এক্ষণে সেই প্রকার সাত্ত্বিক দান ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। তবে অধুনা দান-বীর স্বর্গীয় তারকনাথ পালিত মহাশয় ও দাতাকর্ণ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় যে মহৎ আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ধনবান্ ব্যক্তির অনুকরণযোগ্য। ধনবান্ ব্যক্তিগণ যদি বিলাসিতার ব্যয় কমাইয়া দেশহিতকর ধর্ম্মকার্য্যের সাহায্য করেন, তা হইলে আবার দেশে

সৌভাগ্য সূর্য্য উদিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিবে।

প্রাচ্যকেও পাশ্চাত্য হইতে পাশ্চাত্যের গুণগুলি নিজের করিয়া লইতে হইবে, কিন্তু প্রাচ্য-আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। যে দেশে বেদ, উপনিষদ্, দর্শন প্রভৃতি মহামূল্য গ্রন্থগুলির উৎপত্তি, যে দেশে লীলাবতী, গার্গী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতির ন্যায় আদর্শমহিলা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশের আদর্শ অন্য স্থান হইতে লইবার তত প্রয়োজন নাই।

শ্রীগিরিজা প্রসন্ন সেন,
'গঙ্গাপ্রসাদ নিকেতন,' কুমার টুলী,
কলিকাতা।

চিরকুমারীর ব্রত।

১

প্রশান্ত ধরণী'পর ঢল ঢল শশধর,
অতুলন শোভা কিবা নিখিল ভুবনে,
প্রকৃতি-সুন্দরী হায়! ছড়ায় মাধুরী তায়,
নদী গিরি লোকালয় বন উপবনে।

২

রজত-জোছনাময়ী, রজনী কি শোভাময়ী,
মৃদু মন্দ সমীরণ বিপিনে গাহিছে,
কুসুম ঘরের মেয়ে, উঁকি মেরে দেখে চেয়ে,
চন্দ্রমা সোহাগ-ভরে কারে যে ডাকিছে!

৩

কভু ভাবে ডাকে তারে, ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে তাঁরে,
থাকে যেন ম্লানভরে একাকী বিরলে,
পবন রহস্য ক'রে, তায় যেন তুলে ধরে,
অভিমানে ম্রিয়মাণ হয় সেই কালে।

৪

এ হেন সময়ে হায়! কে গো ওই ধীরে যায়,
সরলা কামিনী এক কাহার উদ্দেশে,
বিধুমুখী এলোকেশী, ছড়ায়ে লাবণ্যরাশি,
সরসীর তীরে গিয়ে বসে অবশেষে।

৫

চিবুকে কনক-ছটা, আহা কি রূপের ঘটা,
স্বরগের ফুল যেন ফুটেছে কাননে,
সে অধর বিহসিত, প্রাণ মন পুলকিত,
গাইবে প্রেমের গীতি এ হেন বিজনে।

৬

নিশাচর ডাকে দূরে, প্রতিধ্বনি আসে ঘুরে,
নীরব মাধুরী কত প্রকৃতির মাঝে,
বসেছে একান্তে নারী, নাহি কেহ বিঘ্নকারী,
গভীর সে নিশীথিনী সম্মুখে বিরাজে।

৭

অনন্তের ছায়া-প্রায়, কৌমুদীর প্রতিচ্ছায়,
করিছে মধুর গীত অচ্ছোদ-সলিল,

* এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাগণের মতামত এবং যে বিষয়ের সহিত তাঁহাদের মতের মিল না হয় তাহার প্রতিবাদ পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব। শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এজন্য এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। বা, বো, স।

মধুরে মধুরে কিবা, ফুটেছে অতুল বিভা,
আনন্দেতে ভরপুর এ বিশ্ব নিখিল।

৮

হইয়াছে প্রস্ফুটিত, কুসুমেরা সুবাসিত,
সুগন্ধ ছড়ায়ে দিক করে আমোদিত,
বলয়-শোভিত-কর, যুক্ত রহে নিরন্তর,
বিস্ময়ে পুলকে প্রাণ হয় উচ্ছ্বসিত।

৯

প্রেমে বিকশিত মুখ, নাহি পাপ নাহি দুঃখ,
নিষ্কলঙ্ক মুখখানি সদা ফুটে রয়,
অপূর্ব্ব জ্যোতির মাঝে, নিরুপম রূপ রাজে
কোন শোভা এর কাছে সমতুল নয়!

১০

চন্দ্রমা সে বিধুমুখে, চুমিয়া মনের সুখে,
অনিমেষে চায় তার সেই দিব্যধামে,
বিম্বাধরে উঠে স্বর, 'প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর'!
নয়নে স্ফুলিঙ্গ তার সে অমৃত নামে।

১১

সহসা কুসুমরাণী, শুনিল তাহার বাণী,
মধুর কাতরধ্বনি পশিল হৃদয়ে
কিন্তু রে সামর্থ্য নাই, যাইবার নাহি ঠাঁই,
শূন্য'পরে সমীরণ নাচে তা'রে লয়ে।

১২

দিগ্বিদিক শুভ্রকায়, অনন্তে মিশিয়া যায়,
বিজলি চমকে কিবা প্রেমের পরশে,
জল স্থল নাহি শূন্য, প্রেমে সব পরিপূর্ণ,
জাগিল তাহার প্রাণ নবীন হরষে।

১৩

বসন-অঞ্চল ফেলি, প্রভঞ্জন করে কেলি,
সারি সারি বৃক্ষগুলি হয়ে সচেতন,
আজ তারে ভালবেসে, কতই মধুর হেসে,
আপনার জন বলে করে সম্ভাষণ।

১৪

কত মিষ্ট কথা কয়, প্রাণে প্রাণে কি যে লয়,
দেখে প্রেম-সূত্রে বাঁধা নিখিল ভুবন,
ধরে সেই সূত্রটিরে, নামে ধনী ধীরে ধীরে,
চিদানন্দ স্বরূপেতে হইতে মগন।

১৫

প্রাণ মাঝে প্রাণেশ্বর, প্রকাশিয়ে অনন্তর
কতই মধুর প্রীতি করেন বর্ষণ,
পরাণ পাগলপারা, দুনয়নে বহে ধারা,
প্রিয়তম সনে এই মধুর মিলন।

১৬

কণ্ঠে ধ্বনি "প্রাণেশ্বর," রোমাঞ্চিত কলেবর
কুসুম জানিল বর এসেছে তাহার,
চির কুমারীর ব্রত, চিদানন্দ ধ্যানে রত,
হৃদয়ে বিকাশি উঠে আনন্দ অপার।

শ্রীমান সুকান্তি লিখিত দৈনিক লিপি।

১৬ই অগ্রহায়ণ। ১লা ডিসেম্বর।
জগদীশ! আজ প্রাণমন এত চঞ্চল হইল কেন বুঝি না। ঝটিকা-বিস্ফুরিত তরঙ্গরাশির ন্যায় মনে এক অভাবনীয়

চঞ্চলতা আসিয়াছে। তাই আজ তোমার চরণপ্রান্তে শান্তিলাভের জন্য উপস্থিত। দয়াময় এ পাপ পরাণে তোমার করুণা বারি সিঞ্চন কর। হৃদয়ের মলিনতা দূর হউক, চাঞ্চল্য বিদূরিত হউক। তোমার চিন্তনে যেন জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। তুমি যে দয়ার সাগর, পতিত-পাবন প্রভু, তোমার কাছে যে আসে সে তো কখনও শূন্য হৃদয়ে ফেরে না। তোমার শান্ত মধুর ভাব একবার হৃদয়ে ঢুকিতে পারিলে ত আর সংসারে কোন কষ্ট নাই, বিষাদ নাই। তুমি তখন জীবনের চালক হইয়া সুপথে তোমার দিকে চালাইয়া লও। ধন্য সে জীবন মানব-নামের সার্থকতা ত তাহারই জীবনে। সেই তোমাকে পাইয়াছে। সংসারের প্রলোভনে পড়িয়া মন সর্ব্বদা তোমা হইতে দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাই আমরা এত কষ্ট পাই, জীবনের কর্ত্তব্য ভুলিয়া শান্তির আশে কুপথে আকৃষ্ট হইয়া শেষে অনুতাপ করি। তখন আবার মনে তোমাকে পাইবার জন্য আকুল পিপাসা উপস্থিত হয়। তখন বুঝিতে পারি তুমিই একমাত্র শান্তির প্রস্রবণ। দয়াময়, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক বিকশিত কর। তোমার মহিমা যেন হৃদয়ে অনুভব করিয়া, তোমার চিন্তায় প্রত্যহ একবার নির্জ্জনে বসিতে পারি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক প্রভু! ওঁ।

হাজরা লেন, কলিকাতা।

১৩১৯। ১৭ই অগ্রহায়ণ—২-১২-১২।

পরমপিতা পরমেশ, তোমার চিন্তনে কত শান্তি, কত সুখ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যখন মনে হয় আমার পিছনে তোমার ন্যায় অসীমশক্তি কার্য্য করিতেছে, তখন মনে কত আশার সঞ্চার হয়। মনে হয় তবে আমার ভয় কি, চিন্তা কি? কিন্তু তোমার অস্তিত্ব ভুলিয়া যাই, পৃথিবীর বাহ্যিক প্রলোভনে পড়িয়া হাবুডুবু খাই, তখন আবার তোমার কথা সত্যই মনে উদয় হয়—তখন মনে হয় এবার বুঝি আমায় দয়া করিবে না। এবার বুঝি তুমি ক্ষমা করিবে না। দয়াময়! কিন্তু তোমার স্নেহ, করুণা তখনও হারাই না। কাতর প্রাণে তোমাকে ডাকিলে, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে, তুমি কেমন শান্ত মূর্ত্তিতে আসিয়া ধরা দাও। তোমার করুণা কি অসীম! তোমার দয়ার শেষ নাই প্রভু। তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার এই অকৃতি সন্তান তোমার নিকট প্রাণ খুলে হৃদয়ের বেদনা জানাইতে পারে ও তোমার মহিমায় হৃদয়ের বেদনা উপলব্ধি করিতে পারে। এই কর প্রভু! যেন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

১৩১৯। ১৮ই অগ্রহায়ণ। ৩রা ডিসেম্বর। ১২।

দয়াময়, আজ যে আবার পথভ্রষ্ট হ'য়ে তোমা হইতে অনেক দূরে এসে পড়েছি, কর্ত্তব্য ভুলে গিয়ে অলস ভাবে দিনপাত করিতেছি। তুমি যে অমূল্যধন সঙ্গে দিয়াছিলে তাও হারায়ে ফেলিছি। প্রভু!

চারিদিক যেন শূন্য বোধ হইতেছে। তাই তোমার করুণাকণা! হৃদয়ে আবার আশাবহ্নি প্রজ্বলিত কর। এ শুষ্ক প্রাণে এক বিন্দু প্রেমবারি সিঞ্চন কর। জ্ঞান পিপাসা হৃদয়ে জাগাইয়া দাও প্রভু! আশীর্ব্বাদ কর যেন এবার হ'তে আর তোমার নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত না হই। পাগলের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া এবার তোমার দ্বারে উপস্থিত প্রভু! কেবল ধাক্কা খাইলাম লাঞ্ছিত হইলাম, আর কেহ ত প্রাণের আশা মিটাইতে পারিল না. ভাল মুখে একটা কথা কহিল না। তোমার ন্যায় পাপীর বন্ধু আর কে আছে? শূন্য হৃদয়ে পৃথিবীর এক কোণে পড়িয়াছিলাম! সংসারের দুঃখ কষ্ট দেখে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়া ষড়রিপুর বশ হইয়াছিলাম। কখনও ভাবিতাম এই বুঝি শান্তি পাইলাম, আবার ধাক্কা খাইয়া মোহ ভাঙ্গিত। যে যখন যে দিকে চালাইত, সেই দিকেই যাইতাম। হায়! আমি কি মূর্খ, আমি কি অধম, তোমার কথা একবারও মনে পড়ে নাই। কি মোহে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন ছিল যে তোমার আহ্বানও কর্ণে প্রবেশ করে নাই। এবার তোমায় চিনিয়াছি প্রভু! তুমি যে দয়াময়, পাপীর সম্বল তাহা বেশ বুঝিয়াছি। যদি দয়া করিয়া সুমতি দিয়াছ তবে মাঝে মাঝে লুকায়ে থাক কেন, প্রভু! আমার হৃদয় যে বড় দুর্ব্বল। তোমাকে না দেখিলেই আবার ছয় জনায় মিলে আমায় কুপথে টানিবে। তুমি প্রহরীর মত থাকিয়া আমায় রক্ষা কর প্রভু!

২১শে অগ্রহায়ণ। ৬ই ডিসেম্বর। ১২

পরম পিতা পরমেশ, তোমার এ অধম সন্তানে কি কৃপা করিবে না প্রভু! তোমার করুণায় বাঁচিয়া আছি সত্য, কিন্তু তোমায় বুঝিতে পারি কই? মৎস্য যেমন জলে থাকে, জল ভিন্ন বাঁচিতে পারে না, আমরাও তেমনি তোমার ভিতরে রহিয়াছি, তোমা ভিন্ন আমরাও নিশ্চল নিষ্পন্দ হই। কিন্তু প্রভু! সেই জীবনের জীবনকে বুঝিতে পারিব না, একি কম আক্ষেপের কথা। তুমি আমাকে রক্ষা করিতেছ, আর আমি তোমার কথা ভুলিয়া আছি! দয়াময়, আর কতকাল লুকায়ে থাকিয়া কষ্ট দিবে? তোমায় পাইবার জন্য মানবের মনে যে আকুল আকাঙ্ক্ষা দিয়াছ, মানবকে বুঝিতে দিয়াছ যে তুমিই তাহার প্রাণ, তবে সে আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখ কেন প্রভু! জগতের পিতা তুমি, তোমার রাজ্যের কেমন শৃঙ্খলতা, সেখানে কেমন শান্তি বিরাজ করিতেছে। মানবকে স্বাধীনতা দিয়ে পাঠাইয়াছ সত্য, কিন্তু তোমার সাহায্য ব্যতীত কাহারও একপাও নড়িবার যো নাই। তোমাকে না বুঝিলে সংসার মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক, নীরস বলিয়া বোধ হয়। তোমাকে না বুঝিলে সংসারের সুখ কি তাহা বুঝা যায় না, মানবজীবনের কর্ত্তব্য স্থির করা যায় না। তবে কেন প্রভু!

লুকায়ে থাক ? তোমার মহিমা সীমাবদ্ধ মানবহৃদয়ে প্রকাশিত কর প্রভু। তুমি অসীম বলিয়া ক্ষুদ্র মানব তোমাকে কি ধারণা করিতে পারিবে না ? নিশ্চয়ই পারিবে। তুমি ত দয়াল, দয়াসাগর, অসীম-শক্তি-সম্পন্ন। তুমি মানবের নিকট শান্ত, সরল ভাবে ধরা দাও, হৃদয়ে তোমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে ক্ষমতা দাও। ন্যায় অন্যায় বুঝিতে দাও। সংসারে তুমিই আমাদের ধ্রুবতারা ও তুমিই আমাদের চালক। তোমাকে বুঝিতে না পারিয়াই ত বিপথে চলিয়াছিলাম। অমনি মৃত্যু এসে তোমার প্রদত্ত সে অমূল্য ধন কাড়িয়া লইয়াছে। তাই ত পথহারা হ'য়ে তোমায় খুঁজিতেছি। অকৃতী সন্তানকে দেখা দাও প্রভু! তোমার প্রতি অটল বিশ্বাস দাও, মুহূর্ত্তের জন্যও যেন অবিশ্বাস প্রাণে আসে না। তুমি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তোমার প্রতি যেন অবিশ্বাস আসে না। পৃথিবীতে যখনই যে দিকে তাকাই, তখনই তোমার অসীম শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া স্তম্ভিত হই। প্রভাতের বালসূর্য্যের কিরণ-চ্ছটায়, অমানিশার নক্ষত্রের ভিতর, পূর্ণিমার স্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোৎস্নায় তোমারই মহিমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি। তোমাকে অবিশ্বাস করিবার ত কোন কারণ নাই। তবে কেন মাঝে মাঝে তোমায় ভুলে যাই ? কেন তোমার মহিমায় বিশ্বাস হয় না ? দয়াময়, সে দিন টাইটানিক-নামক জাহাজ তোমার ইঙ্গিতে মুহূর্ত্তমধ্যে জলমগ্ন হইল। মানবের ক্ষমতা যে তোমার নিকট বিন্দু হইতে বিন্দু তাহাই তুমি প্রমাণ করিলে। মানবের শক্তি কি ক্ষুদ্র! তোমাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে। তোমার আদেশে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, তবে আমায় চালাও না কেন প্রভু ? আমি ত যেমন তেমনই রহিয়াছি ? এক পদও জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারি নাই। প্রতিপদে কত বাধা, কত কষ্ট! তোমার সাহায্য ভিন্ন কেমন করে এ দুস্তর সাগর পার হইব প্রভু ? দাও, দয়াময়, তোমাতে অটল বিশ্বাস। তোমার কর্ত্তৃত্বে যেন সর্ব্বদা থাকিতে পারি। হৃদয়ে আশা ও বল দাও, কর্ত্তব্যবুদ্ধি দাও। নৈরাশ্য আসিয়া মাঝে মাঝে কর্ত্তব্যচ্যুত করে না যেন। তোমার শক্তির কথা মনে রাখিয়া তোমাকে স্মরণ করিয়া যেন প্রত্যেক কার্য্যে রত হইতে পারি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

১৩১৯। ২২শে অগ্রহায়ণ। ৭ই ডিসেম্বর। ১২।

জগৎপিতা জগদীশ, মানবকে তুমি জগতের শ্রেষ্ঠ জীব করিলে; বিবেক, বুদ্ধি, মন দিয়া গঠন করিলে; তবুও মানব তোমায় বুঝিতে পারে না কেন প্রভু? প্রত্যেক মানবকে এক একটী মনোরাজ্য দিয়াছ, শাসন করিবার জন্য বিবেক দিয়াছ, বুদ্ধি দিয়াছ। কিন্তু আমরা রাজ্য পালন না করিয়া দুষ্ট প্রজা কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়িয়াছি, তোমাকে যে আমাদের রাজা বলিয়া আর মানিতে চাই

নাই! এখন তোমার সাহায্য ভিন্ন ত আর এ প্রকৃতিকে দমন করিতে পারিতেছি না। তুমি বল দাও, শক্তি দাও। তুমি হাতে ধরে টেনে উঠাও প্রভু। তুমি কেমন সুন্দর করে সাজিয়ে পৃথিবীতে সুধা কিনিবার জন্য পাঠাইয়াছিলে, সঙ্গে কত প্রহরী দিয়াছিলে, অমূল্য ধন দিয়াছিলে, আমি অবিবেক বশতঃ সব হারাইয়া বসিলাম। জ্ঞান পাইয়া জ্ঞান হারাইলাম! তোমার আলো পাইয়াও আবার অন্ধকারে ডুবিলাম। যে তোমার আদেশ পালন করিয়া চলিয়াছে, তাহার নিকট পৃথিবী কেমন সুন্দর,কেমন শান্তির স্থান। তুমি মানবকে যে অসীম শক্তি দিয়া পাঠাইয়াছ, তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে দাও। বিবেক-বুদ্ধির বলে মানব কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে। তুমি যাহার অভিভাবক, তাহার ত কিছুই অসাধ্য নাই। তোমার শক্তির যে এক বিন্দু হৃদয়ে দিয়াছ, তাহারই প্রভাবে মানব আজ শূন্যমার্গে বিচরণ করিতে সক্ষম। তুমি যেমন মানব-হৃদয়ে অতৃপ্ত বাসনা দিয়াছ,তেমনি সে সব পূর্ণ করিবার শক্তিও ত দিয়াছ। কি মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছি যে, সে শক্তি হৃদয়ে অনুভব করি না। দয়াময়, তুমি হৃদয়ে সেই শক্তির বিকাশ কর, যেন তাহার প্রভাবে মানবজীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি। তবেই ত প্রভু, তোমায় ভাল করিয়া চিনিতে পারিব। কতকাল আর ঘুমঘোরে অচেতন থাকিব। দয়া কর প্রভু, এ জীবনে আবার ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত কর। হৃদয়ের কালিমা দূর হউক। সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় যেন হুঙ্কার ছাড়িয়া তোমার আদেশ পালনে রত হই। সত্যকে আশ্রয় করিয়া তোমার করুণায় যেন কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারি এই কর প্রভু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

৺ সুকান্তির মৃত্যু উপলক্ষে।

সুকান্তি আমার পরম আত্মীয়। ইহাঁর অভাবে আমরা নিতান্ত সহায়হীন ও কাতর হইয়া পড়িয়াছি। ইহাঁর পিতা-মাতার কথাত লিখিয়া জনসমাজে প্রকাশ করা অসাধ্য।

ইহাঁর পিতার নাম শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র সেন। ইহাঁর পিতা সুশীল, সুবোধ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। কিন্তু সুকান্তির ন্যায় উৎসাহশীল, উদার, সরল ও ধার্ম্মিক পুত্রের অকাল মৃত্যু তাঁহাকে একেবারে দিশাহারা করিয়া ফেলিয়াছে।

সুকান্তি শ্রীমতী রাখালদাসীনাম্নী একটি নিষ্ঠাবতী রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। শ্রীমতী রাখালদাসী পুত্রের অভাবে অনাহার-ব্রত গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়া-

ছেন। সমস্ত রজনীর মধ্যেও তিনি নিদ্রা যান না, কেবল মধুর স্বরে হরিনাম গান করিয়া থাকেন।

পিতামাতার উপযুক্ত পুত্র ৺সুকান্তির ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ না করিয়া তিনি কোনও কাজেই হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার নিজ হস্ত-লিখিত দৈনিক ডায়েরীতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

১২৯৯ সনের ২২শে আষাঢ় মঙ্গলবার ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩২০ সালের ৩০শে অগ্রহায়ণ রবিবারে কালীঘাটে ৬নং নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের লেনে বেলা ৪টার সময় সান্নিপাতিক জ্বরে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি St. Xavier College এ B. Sc. (fourth year) পড়িতেন। একদিন Test পরীক্ষা দিয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়াছিলেন।

ইহঁার অভাবে পৃথিবী একটি সুসন্তান হারাইয়াছেন। এমন মিষ্টভাষী, পরোপকারী, উৎসাহশীল ও ধর্ম্মভীরু সন্তানের অভাবে দেশও মহাক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

কবিতার প্রাণ।

কবিতা কি প্রাণশূন্য! সত্য বটে, আজকালিকার অনেক কবিতার ভাষা আছে, ছন্দ আছে, উপমার ঘটা আছে ও অনুপ্রাসেরও ছটা আছে, কিন্তু নাই কেবল ভাব, নাই কেবল প্রাণ! তাই সেগুলিকে কবিতা না বলিয়া অন্য কিছু বলিলে, বোধ করি ক্ষতি, হয় না। কিন্তু শুনিয়াছি যে, কয়েকটী কবিতা ও একখানি উপন্যাস আমেরিকায় প্রচলিত জঘন্য দাস বিক্রয়-ব্যবসায়ের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিল। যদি এই উক্তির ঐতিহাসিকতা ও সারবত্তা মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে অস্বীকার করা যায় না যে, কবিতার প্রাণ আছে। বস্তুতঃ বিবিধ ছন্দোবদ্ধ সুললিত শব্দপিণ্ডময় কবিতাগুলির শব্দালঙ্কারের ঘটা ও উপমার ছটা থাকিলেও তাহাদিগকে "কবিতা" এই আখ্যা প্রদান করিলে প্রকৃত কবিতার অবমাননা করা হয়। যে কবিতার ভাব আছে, ভাবের পরিস্ফুটনা আছে, এমন কি যে কবিতায় ভাব ও ভাষা ওতঃপ্রোত ভাবে অবস্থিত অর্থাৎ যে কবিতার ভাষা ও ছন্দ তাহার প্রত্যেক ভাবকে সুক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে স্ফুটতর করিয়া তুলিতেছে, সে কবিতা যে প্রাণহীন তাহা কেমন করিয়া বলি! কাউপারের "Jhon Gilpin" কবিতাটী কোনও নিপুণ আবৃত্তিকারক দ্বারা কোন সভাস্থলে আবৃত্তি করা হইলে সভাকক্ষটি সুবিমল হাস্যধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে! কোলরিজের "Ancient Mariner" পাঠ

করিলে হৃদয় যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়। Shelleyর "Skylark" কবিতাটী পাঠ করিলে হৃদয় যেন উধাও হইয়া কোন এক দূর দূরতর স্বপ্নরাজ্যে উড়িয়া যায়! Campbell এর "Ye Mariners of England" কবিতাটী হৃদয়দেশ স্বজাতি-গৌরবে ও স্বদেশপ্রেমে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। নবীন বাবুর শান্তিরসাত্মক কবিতাগুলি অবসাদপূর্ণ ও দুঃখক্লিষ্ট প্রাণে যখন আমরা পুনঃ পুনঃ পাঠ করি, তখন আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল শান্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে! অমরকবি মধুসূদনের অমর-কাব্য "মেঘনাদ বধে" প্রমীলার চিতাধিরোহণ-সময়ে শোকাকুল রাবণের বিলাপোক্তি মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া অজ্ঞাতসারে নেত্রযুগল অশ্রু-ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে!

ঐ সকল ভাবপ্রাণ কবিতার যখন একটা ক্রিয়া (action) আছে, উহারা যখন ইচ্ছা করিলেই ক্ষণকালের মধ্যে আমাদের প্রসুপ্ত ভাবতন্ত্রীগুলিকে কোন এক অদৃশ্য অঙ্গুলির স্পর্শে জাগাইয়া দিতে পারে, তখন আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ কবিতাগুলি প্রাণময়ী ও সজীব। কবি যে কোন ভাব লইয়াই আলোচনা করুন না কেন, তাঁহার কবিতায় সেই ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি থাকা আবশ্যক।

যখন শব্দমাত্রেই কোন একটা ভাবের সংবাহক ও প্রতিমূর্ত্তি এবং সেই শব্দগুলি যখন প্রত্যেক কবিতায় বাক্যাকারে গ্রথিত, তখন সকল কবিতাই যে ভাবময়, এমন প্রশ্নও কেহ কেহ তুলিতে পারেন। কথাটা তাহা হইলে একটু সবিস্তারে বুঝা আবশ্যক। ফুলরাশি মালা নহে, ফুলগুলি সূত্রবদ্ধ করিয়া মালার মত করিয়া গাঁথিলেই তাহা ফুলমালা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় একবার এক বক্তৃতায় যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, কতকগুলি বেল ফুলের সহিত যদি কতকগুলি জুঁই ফুল মিশাইয়া মালা গাঁথা হয়, এবং লোককে বলা হয় যে, উহা কেবল বেল ফুলের মালা, তাহা হইলে লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? পুনশ্চ বর-সজ্জার (ফুলশয্যার) নিমিত্ত ফুলের মালা আবশ্যক, যদি তৎপরিবর্ত্তে বরের গলে পুঁতির মালা পরাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি প্রথামত কার্য্য করা হইবে? যেমনই শ্রুতিকটুই হউক, আর সুললিতই হউক, শব্দের সমষ্টি বা যোজনা মাত্রই বাক্য নহে। বাক্যরচনার একটা নিয়ম বা প্রণালী আছে। অপিচ সময়ে সময়ে রচয়িতার অক্ষমতা-নিবন্ধন কবিতায় হয়ত এমন পরস্পর-বিরুদ্ধাত্মক ভাব প্রকাশ ও ভাষার ব্যবহার করা হয় যে, তাহাদের যৌগিক সম্মিলনে বস্তুতঃ কোনও মৌলিক রসেরই উদ্দীপনা হয় না! ভাব ও ভাষার সুন্দররূপে একত্র সমাবেশ না থাকিলে কবিতামালা গ্রথিত হইতে পারে না। কবি যে ভাবের অভিব্যক্তি করিতে চাহেন, যদি হৃদয়স্পর্শী ভাষার প্রভাবে তাঁহার কবিতায় স্বতঃই সেই ভাবের পূর্ণপ্রকাশ

পরিলক্ষিত হয়, তবে বলিতে হইবে যে, তাঁহার কবিতায় জীবনী শক্তি আছে, তাহা প্রাণময়ী। পরন্তু বিরুদ্ধভাবাত্মক ভাষা বা ভঙ্গির ব্যবহার শূন্য হইয়াও কোনও কবিতায় যদি অভিপ্রেত ভাবের স্পষ্ট অভিব্যক্তি না থাকে, তবে তাহা প্রাণহীন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র দাস।

ভূত না মানুষ।

আমি ব্যাকুল হইয়াছি আমার কন্যার জন্য। একবার সে তাহাদের হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছিল, এবার দেখিতেছি সত্য সত্যই সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

নন্দক কহিলেন "মা, তুমি আমার ভগিনীর জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুল হইও না। যে তাহাকে লইয়া গিয়াছে, সে কখনও তাহার অনিষ্ট সাধন করিবে না, কারণ সে তাহাকে ভালবাসে। তোমাদের বিশ্বাস যে, সে একবার তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিত বলিয়া সবল হস্তে মারিতে পারে নাই। সেই জন্যই তুমি তাহাকে বাঁচাইতে পারিয়াছিলে। এখনও সে তাহাকে মারিতে পারিবে না, বরং আদরের সহিত পালন করিবে। চল, এখন আমরা তাহাদের উদ্দেশে বহির্গত হই। দেবদত্ত কেমন আছেন?" নন্দকের মাতা নন্দকের কথায় অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন, অতএব রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন, "তুমি রাজপুতানাভিমুখে বহির্গত হইয়া চলিয়া গেলে, আমার অনুমতানুসারে সে তোমার অনুসরণ করিয়াছিল। তোমার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ফিরিয়া আসিবার কথাও ছিল, কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া আমি চিন্তিত হইতেছি—সেও কি তবে শত্রু-হস্তে নিপতিত হইল?"

"অসম্ভব কি! চল এখন চল, আর বিলম্বে দরকার নাই" এই বলিয়া নন্দক বিশ্বস্ত ভৃত্যদিগকে সতর্ক ভাবে বাটী রক্ষা করিতে কহিয়া নিজে মাতার সহিত বহির্গত হইলেন। তখন রজনী প্রভাত হইয়া গিয়াছে। নন্দকের আগমনের পর এই ২০ মিনিট অতীত হইল। তথায় তাহারা উক্ত কুসুমিত বনের মধ্য দিয়াই রওনা হইল। এই বনের মধ্যে পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে একবার দেবদত্তের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে যাহাহউক, দেবদত্তের ভাগ্য নন্দককে সেই পথ দিয়াই টানিয়া লইয়া চলিল। নন্দক জননীকে আপন পৃষ্ঠ-দেশে উপবেশন করাইয়া বিদ্যুদ্বেগে সাত্যকীকে ছুটাইয়া দিলেন। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই বহু লোকের ও অশ্বের পদচিহ্ন তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ইহাতে তিনি ও তাঁহার মাতা অত্যন্ত পুলকিত ও

পুলকিতা হইলেন। ঘোড়া নিয়মিতরূপে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। অশ্ব ও অশ্বারোহীর বিরাম বিশ্রাম রহিল না। যে স্থানে গিয়া দেবদত্ত বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও যথাকালে গিয়া সেই খানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থলে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কিঞ্চিৎকাল চিন্তামগ্ন রহিলেন। দেখিলেন, সেটা মানুষের বিশ্রামের উপযুক্ত স্থানই বটে। তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সুদূরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাঁহার মনে সন্দেহের উদয় হইল। তিনি সাত্যকীকে একখানি কাল বর্ণের প্রস্তরের পার্শ্বে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া মাতার সঙ্গে বনপথে প্রবেশপূর্ব্বক হাঁমাগুড়ি দিয়া সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে নন্দক বিজ্ঞতা সহকারে বুঝিতে পারিলেন যে,জনকতক লোক দেবদত্তকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তখন তাহারা পূর্ব্ববৎ হাঁমাগুড়ি দিতে দিতেই যথাসম্ভব শীঘ্র করিয়া গিয়া আপনাদের অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং প্রায় শত হস্ত দূরে থাকিয়া যথাসম্ভব সতর্ক হইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে সেই সব মনুষ্য বাহকেরা দেবদত্তকে একখানি নৌকাতে আরোহণ করাইল এবং নৌকা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে লইয়া যতদূর সম্ভব দ্রুতবেগে নৌকা চালাইয়া দিল। নন্দকও বনের মধ্য দিয়া নৌকার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিলেন। তিন ঘণ্টা কাল ছুটা ছুটীর পর নৌকা তীরবর্ত্তী হইল।" নৌকার ভিতরেই শিবিকা ছিল। নৌকা চালকেরা শিবিকা-বাহক হইয়া দেবদত্তকে লইয়া ছুটিয়া চলিল। নন্দক সাত্যকীকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে ইঙ্গিত করিয়া নিজেরা যথাসম্ভব দ্রুতবেগে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। নন্দক ও নন্দকের মাতা অন্ধকারে লতা-পত্রের মধ্যে এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে চলিতেছিলেন যে, বিপক্ষেরা পশ্চাৎ দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিয়াও তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছিলেন না। শিবিকার বাহকস্বরূপ আট জন লোক ছিল। আরও দুইজন লোক শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিল। হঠাৎ তাহাদের মধ্যে একজন, পরক্ষণেই অপর জন, নন্দকের বজ্রসম মুষ্ট্যাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। নন্দক যথাসম্ভব ক্ষিপ্রহস্তে লতাপল্লব দ্বারা তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া রাখিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিবিকার দুই দিকে ডাণ্ডা থাকে। বাহকেরা ঐ ডাণ্ডা স্কন্ধে করিয়া শিবিকা বহন করিয়া লইয়া যায়। নন্দক একজন বাহকের পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক এমনি সজোরে আকর্ষণ করিলেন যে, সে ভূমিতলে পড়িয়া জ্ঞানহীন হইল। তাহার মৃদু পতন শব্দ কাহারও কর্ণগোচর হইল না। তারপর তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও ঐ দশা প্রাপ্ত করাইলেন। তখন বিপক্ষদের

চৈতন্যোদয় হইল। অন্ধকারে কোন দিকে দৃষ্টি চলে না। তথাপি তাহারা বুঝিতে পারিল যে, শত্রু তাহাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়াছে। তাহারা চারিজন লোক হারাইয়াছে, কারণ তাহারা তাহাদের কোন সাড়া শব্দই পাইতেছিল না। নন্দক তখন আপনার গুপ্ত লণ্ঠন প্রজ্বলিত করিয়া আপনার মুখের নিকট ধারণ করিলেন। তৎকালে বাহকেরা শিবিকা ভূমিতলে না নামাইলেও চলিতেছিল না, স্তব্ধভাবে এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিক দেখিতেছিল। নন্দক তখন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যদি কেহ আমার পরিচিত থাক, তবে দেখ আমি কে। মিথ্যা কথা নহে, ভাল করিয়া দেখ—আমি নন্দক, যাহার তরবারীর আঘাতে প্রচণ্ড পর্ব্বতও খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এই বলিয়া নন্দক, লণ্ঠন জননীর হস্তে প্রদানপূর্ব্বক, শত্রুমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ হস্তে পিস্তল ধারণপূর্ব্বক বামহস্তে তরবারী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। বাহকদের মধ্যে দুইজন ছিল। তাহারা শিবিকা ভূমিতলে রাখিয়া নন্দককে আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু কেহ তরবারীর আঘাতে হত হইল, কেহ বন্দুকের আঘাতে ভীষণরূপে আহত হইল, কেহ পলাইয়া গেল, তখন নন্দক শিবিকা হইতে দেবদত্তকে বাহির করিয়া জননীর সাহায্যে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহারা একটি নিরাপদ স্থান খুঁজিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে রজনী প্রভাত হইয়া গেল, তিনি বনপথ ত্যাগ করিয়া একটি খোলা মাঠে আসিলেন এবং দেবদত্তকে ভূমিতলে শয়ন করাইয়া তাহার মস্তক আপন কোলে ধারণ করিয়া রহিলেন। তাহার মাতা দেবদত্তের এই দশা অবলোকনপূর্ব্বক শোকে একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং পুরুষবেশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় সেই বাৎসল্যময়ী রমণীর বেশ পরিধানপূর্ব্বক দেবদত্তের নিকট উপবেশন করিয়া তাহার চোকে,মুখে ফুৎকার দিতে লাগিলেন এবং নানারূপ গাছ গাছড়া হস্তে পেষণ করিয়া কখনও দেবদত্তের নাসিকারন্ধ্রে, কখনও ব্রহ্মরন্ধ্রে, কখনও নাভিদেশে, কখনও পদতলে, লেপন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে দেবদত্তের চৈতন্যের সঞ্চার হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন নন্দক তাহার মস্তক ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক স্থির ভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, আর নন্দকের মাতা তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক তাহার পরিচর্য্যায় রত রহিয়াছেন। দেবদত্তকে চক্ষু উন্মিলন করিতে দেখিয়া নন্দক ও নন্দকের মাতা যুগবৎ আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।　(ক্রমশঃ)

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

৺ গোপালকৃষ্ণ গোখেল।

ভারতমাতার সুসন্তান, দেশগৌরব, কর্ম্মবীর গোপালকৃষ্ণ গোখেল ৭ই ফাল্গুন রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকার সময় ৪৯ বৎসর মাত্র বয়সে দুইটী অবিবাহিতা শিক্ষিতা কন্যা রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই দেশহিতব্রত মহাত্মার তিরোভাবে সমগ্র দেশবাসী শোকাকুল হইয়াছেন। গোখেলের অকাল মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল, ভারতের সে ক্ষতি কতকালে পূর্ণ হইবে তাহা জানি না।

প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া এই কর্ম্মবীর মহারাষ্ট্রতনয়ের খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। মহাত্মা গোপাল-কৃষ্ণ গোখেল ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র দেশের কোলহারপুর নগরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্পবয়সেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া অতি কষ্টে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বি, এ, উপাধি লাভ করেন। ১৮ বৎসর বয়সে পুনা নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে শিক্ষকরূপে প্রবেশ করেন। এই স্কুলটী তিলক প্রভৃতি কয়েকজন মহারাষ্ট্র-দেশ-সেবক ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্থাপন করেন। এই স্কুল বর্ত্তমান সময়ে ফারগুসন কলেজে পরিণত হইয়াছে। গোখেল মাসিক ৭০ টাকা বেতনে এই স্কুলে অর্থ-শাস্ত্র ও ইতিহাস শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করেন। কলেজে শিক্ষকতা করিয়া যে কিছু সময় পাইতেন, তাহা অর্থশাস্ত্র-বিষয়ক পুস্তক সমস্ত অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতেন। দেশের আর্থিক অবস্থা বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞানের বীজ এই স্থানেই রোপিত হয়। এই সময় মহামতি গোবিন্দ রাণাডের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি রীতি-মত রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জাতীয় মহাসমিতির পুণা-অধিবেশনের সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় আয় ব্যয় সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার জন্য 'ওয়েরলি' কমিশন স্থাপিত হয়। এই কমিশনের সমক্ষে সাক্ষী দিবার জন্য মিঃ ওয়াচার সহিত গোখেল বিলাত গমন করেন। এই কমিশনের সমক্ষে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশিত হইলে, সকলেই তাঁহার সারগর্ভ-যুক্তি ও দেশের আর্থিক অবস্থার যথাযথ বিবরণ পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হয়েন। সুতরাং ১৯০২ খৃঃ অব্দে ১৮ বৎসর ফারগুসন কলেজে কার্য্য করিয়া ৪০ ৲ টাকা মাত্র পেন্সন পাইয়া কার্য্য ত্যাগ করেন। এই সময় হইতে গোখেলের প্রকৃত দেশ-সেবা আরম্ভ হইল।

গোখেল সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া অনেক মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থ ভারতীয় শ্রমজীবী-দিগের দুঃখ-ক্লেশ অবসানের জন্য ভারত-

গবর্ণমেণ্ট ও দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইয়া বুয়ার গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিকার-প্রার্থী ও তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে সফলকাম হয়েন। গোখেলের শেষ কীর্ত্তি—সমগ্র ভারতে বাধ্যতামুলক-শিক্ষা-প্রচারের চেষ্টা। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি Public Service Commission-এর সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কমিসনের ফলে যাহাতে ভারতবাসী গভর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য পরিশ্রম করিতেছিলেন, কিন্তু সে পরিশ্রম শেষ হইতে না হইতেই তিনি অকালে চির-বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার অনন্ত উন্নতি ও শান্তি বিধান করুন।

মার্কিণ ও বঙ্গ মহিলা।

বঙ্গদেশের নারীদের ন্যায় মার্কিণ-দেশীয় নারীগণের মধ্যে সরলতা, পবিত্রতা, ঈশ্বরপরায়ণতা প্রভৃতি কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে, স্ত্রীস্বাধীনতার মহা-কেন্দ্রে, আজীবন-মুক্ত মার্কিণ-মহিলাগণ বঙ্গরমণীর ন্যায় নারীর বিশিষ্ট ধর্ম্ম পালন করিতে সক্ষম হন, ইহা প্রকৃতই আশ্চর্য্যের বিষয়। সে দেশের বিদ্যাশিক্ষা, সামাজিক নিয়ম এবং উন্নত ভাব যে ইহার অন্যতম কারণ তাহা অস্বীকার করা যায় না। বঙ্গ ও মার্কিণ মহিলাদের মধ্যে যে প্রকৃতিগত ও দেশাচারগত বিভিন্নতা আছে তাহাও স্বীকার করা যায়। তথাপি এই সকল বিভিন্নতার মধ্যে যে সমতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নারীগণের বশিষ্ট গুণ, এবং তাহা চিরদিনই সমগ্র জগতে অনন্ত ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। নারীর ধর্ম্ম যে সকল-দেশীয় নারীগণ পালন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বঙ্গদেশীয় ও মার্কিণ-দেশীয় রমণীগণের বিভিন্নতা ও সমতা প্রদর্শন করিব ও কি উপায়ে উভয়ে উভয়ের সমকক্ষ হইতে পারেন, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শিক্ষা।

শিক্ষা সাধারণ অর্থে অনেক প্রকার। ইহার মধ্যে বিদ্যা-শিক্ষা, সমাজিক-শিক্ষা ধর্ম্ম-শিক্ষা, স্বাস্থ্যসংরক্ষণ-শিক্ষা প্রভৃতি অনেক বিষয় রহিয়াছে। প্রথমতঃ আমরা বিদ্যাশিক্ষার বিষয় আলোচনা করিব। মার্কিনদেশে প্রত্যেক পিতা-মাতা কন্যাকে সুশিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত। কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে মার্কিনদেশীয় পিতা-মাতা সেই কন্যাকে কি ভাবে প্রতিপালন করিবেন, কি শিক্ষা দিবেন, কি ভাব পোষণ করিতে দিবেন, তাহার

একটী নক্সা করিয়া লন এবং কন্যার বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তাঁহাদের কল্পিত চিত্র বা আদর্শ তাহার সম্মুখে রাখেন ও তাহাকে সেই আদর্শানুযায়ী চলিতে হয়। অবশ্য এই আদর্শ অঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে পিতা-মাতার মধ্যে অনেক আলোচনা হয় ও অনেক সময়ে এই আদর্শের কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। যখন পিতা-মাতা উপলব্ধি করেন যে, কন্যার কোন বিশিষ্ট ভাবের সহিত আদর্শের সমন্বয় হইতেছে না, তখনই এইরূপ করিতে হয়। জ্ঞান-বিকাশের সহিত কন্যাকে এই আদর্শ মানিয়া চলিতে হয় ও ভবিষ্যতে তিনি একজন আদর্শস্থানীয়া হইতে সক্ষম হন। অনেকে এই ভাবের পোষকতা করিতে অক্ষম হইবেন, কারণ তাঁহারা ভাবিবেন যে, ইহাতে কন্যার বাল্যকাল হইতে স্বাধীনভাবে কার্য্যকরণের প্রশ্রয় না দিয়া তাহা খর্ব্ব করা হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। এই আদর্শ চিত্রে উহার সম্পূর্ণভাবে পোষকতা করা হইয়াছে। অধিকন্তু, উহা সুশিক্ষিত পিতামাতার বুদ্ধি জ্ঞানের দ্বারা সংযত হইয়াছে, কারণ এরূপ না হইলে পরে স্বেচ্ছাচারিতা আনীত হয়। মার্কিণদেশের পিতা-মাতারা যে কেবল এই পন্থাবলম্বী তাহা নহে, এমন কি সেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ঐ ভাবকে উৎসাহ দিয়া থাকে ও তাহাদের শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধীয় নিয়মাবলিও তাহার পোষকতা করিয়া থাকে। যে শিক্ষা কেবল কতকগুলি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ করিতে দেয় ও সম্যক উপলব্ধি করিয়া জীবনের দৈনিক কার্য্যে নিয়োজিত করিতে সাহায্য না করে, তাহা প্রকৃত শিক্ষা নহে। মার্কিণ-দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দুইটী বিশেষত্ব আছে, যথা— Co-educational অর্থাৎ যাহাতে পুরুষ ও নারী একত্রে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় ও Practical অর্থাৎ তাহারা কার্য্যকরী শিক্ষা প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ যাহা চলিত কথায় বলে 'পুথিগত বিদ্যা' তাহা নহে। আমাদের দেশের শিক্ষার সহিত মার্কিণদেশের শিক্ষার অনেক বিভিন্নতা আছে। সেখানে নারীদের যাহা সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজনীয়, সেই বিষয়গুলি বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়, যথা child-nature, millinery (টুপি করা প্রভৃতি পরিচ্ছদের কাজ), domestic science (গার্হস্থ্য বিজ্ঞান), laundry (কাপড় ধোলাই ও ইস্ত্রির কাজ), cooking, hygiene (স্বাস্থ্য বিজ্ঞান)—অর্থাৎ যাহা শিক্ষা করিলে ভবিষ্যতে তাঁহারা সুগৃহিণী হইতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সকল শিক্ষা প্রদত্ত হয়। এই সকল বিষয়ে নিয়মিত পরীক্ষা লওয়া হইয়া থাকে। এগুলি compulsory subjects বলিলেও চলে। এই বিষয়গুলিতে কৃতকার্য্য হইলে অন্যান্য বিষয় যথা—ইংরাজি, ইতিহাস, গণিত, দর্শন-শাস্ত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতি elective (নৈর্ব্বাচিক ভাবে) শিক্ষা করিতে পারেন।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় co-educationalত নহেই, অথচ মার্কিণ

বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলিকে compulsory subjects বলিয়া গণ্য করেন, সেগুলিও এদেশস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না। যে সকল পিতামাতা কন্যাগণকে সুগৃহিণী করিবার জন্য এই সকল শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনীয় বোধ করেন তাঁহারাই নিজের গৃহে অথবা অন্য কোন স্থানে শিক্ষা প্রাপ্ত হইবার ব্যবস্থা করেন, সুতরাং বঙ্গমহিলাগণ এ সকল বিষয়ে মার্কিণ মহিলাদের সমকক্ষ হইতে পারেন না। তাহার কারণ পিতামাতার ঐ সকল বিষয়ে অনুৎসাহ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাবিস্তারের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে অবহেলা। কিন্তু আমরা সকলেই স্বীকার করিব যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশের নারীগণকে সর্ব্ববিষয়ে সুদক্ষ ও উপযুক্ত হইতে দিতেছে না। পুরুষের সহিত যখন নারীর প্রকৃতিগত বিভিন্নতা রহিয়াছে, তখন শিক্ষা-প্রণালীরও কোন কোন বিষয়ে বিভিন্নতার আবশ্যক, নচেৎ নারীগণের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ অভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে ও তাঁহাদের ভবিষ্যতে সুগৃহিণী না হইবারও আশঙ্কা থাকিবে। তাহার পর মার্কিণ দেশে সকল নারীই সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে অতি অল্পসংখ্যক নারীই উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্ম সমাজ ও খৃষ্টীয়ান্ সমাজ এ বিষয়ে উৎসাহী ও উদার। হিন্দুসমাজের ঘোর কুসংস্কারের মধ্যে নারীগণের শিক্ষালাভ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। হিন্দুসমাজের পিতামাতার বিশেষ লক্ষ্য এই যে, তাঁহাদের কন্যা যেন সুগৃহিণী বলিয়া শ্বশুরালয়ে সুখ্যাতি প্রাপ্ত হন, সুতরাং তাঁহারা অতি সামান্য বিদ্যাই লাভ করেন, তবে তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যে সুনিপুণ হন। এক দিকে যেমন তাঁহাদের লাভ, অন্য দিকে তাঁহাদের মধ্যে অনেক অভাব দৃষ্ট হয়। প্রকৃত শিক্ষা, অর্থাৎ যে শিক্ষা বিদ্যা ও সাংসারিক জ্ঞান সমান ভাবে অর্জ্জন করিতে সাহায্য করে, উক্ত তিন সমাজের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর হইয়াছে। এইটী আমাদের একটী বিশেষ অভাব বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে, ও যতদিন এ অভাব মোচন না হইবে, ততদিন আমাদের দেশের উন্নতি সুদূরপরাহত হইয়া রহিবে।

শিক্ষা যেমন নরনারীকে উন্নত ও উদার করে, সেইরূপ কোন কোন স্থানে আত্মম্ভরী ও অহঙ্কারী করে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা এরূপ করে না। বিদ্যার অহঙ্কার একটী ভীষণ জিনিষ, অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও ইহা বর্জ্জন করিতে অক্ষম হন। কিন্তু মার্কিণ মহিলাগণের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়া অহঙ্কারে স্ফীত হন না,—তাঁহাদের গৌরবান্বিত মস্তক, বিনয় ও নম্রতা দেখিতে অতীব মনোহর। নারীর মধ্যে অহঙ্কাররূপ কীট প্রবেশ করিলে তাঁহাদের রমণীয়তা অন্তর্হিত হয়। মার্কিণ-

মহিলাগণ যে অহঙ্কারী হইতে পারেন না, তাহার আর একটী বিশেষ কারণ এই যে, সে দেশে বহুসংখ্যক উপাধিধারি-মহিলা রহিয়াছেন, এই হেতু কেহই অহঙ্কারে স্ফীত হইতে সাহস পান না। আমাদের দেশেও যখন সকল নারী উপাধি প্রাপ্ত হইবেন, তখন এই অহঙ্কার-রূপ কীট—যাহা এখন কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহা আর তাঁহাদের কমনীয়তা নষ্ট করিতে পারিবে না। উচ্চশিক্ষার একটী বিশেষ গুণ এই যে, নারীগণ তদ্দ্বারা আত্মনির্ভরশীল হইতে পারেন। আত্ম-নির্ভর নরনারী উভয়ের একটী শ্রেষ্ঠ গুণ, এই আত্মনির্ভরতা ভিন্ন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। সে কারণ বঙ্গনারীর উচ্চশিক্ষা ভিন্ন বঙ্গদেশের উন্নতি কল্পনা করা বৃথা। এই উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া মার্কিণ মহিলাগণ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কুমারী-অবস্থায় বা যখন বিবাহিতা হন, তখনও তাঁহারা অধ্যাপকের, শিক্ষয়িত্রীর, ডিমন্‌ষ্ট্রেটরের, সম্পাদকের ও যন্ত্রালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাহার দ্বারা তাঁহারা নিজেদের ও পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া থাকেন। বঙ্গমহিলাগণ যেরূপ পরাধীন ভাবে অবস্থান করিতেছেন, মার্কিণ মহিলাগণ তাহার বিপরীত-ভাবাপন্ন। শিক্ষিতা মাতা যেমন সন্তান-সন্ততির সুশিক্ষা ও মঙ্গলোন্নতির জন্য ব্যস্ত, অশিক্ষিতা মাতা তেমন নহেন, ইহা আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি। অনেকে বলিতে পারেন, এই উচ্চশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে না লইয়া গৃহে উপযুক্ত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর নিকট হইতে লইলেও চলিতে পারে, কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে সম্ভবপর নহে, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল ও কলেজের যে সুদৃঢ় নিয়মাবলী ও বাৎসরিক পরীক্ষা আছে তাহাই উচ্চশিক্ষার প্রধান সহায়। ইহা সর্ব্বদেশে পরীক্ষিত ও অনুকরণীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই উচ্চ-শিক্ষার জন্য প্রত্যেক নারীরই ইচ্ছা থাকা উচিত। আমেরিকার কোন্ কোন্ মহিলা উচ্চশিক্ষা পাইবার জন্য ব্যগ্র, তাহার তদন্তের ভার মিস্ কেলির উপর ছিল। তিনি তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন —"আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল মহিলা দেখিতে সুশ্রী নহেন, তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদিগকে কেহ বিবাহ করিবেন না, সে কারণ তাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইচ্ছুক। ভবিষ্যতে আত্ম-নির্ভরশীল হইয়া থাকাই তাঁহাদের এক-মাত্র উদ্দেশ্য।" ইহা আমাদের নিকট অনেকটা অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়। উচ্চ-শিক্ষালাভ সম্বন্ধে সুন্দরী বা কুরূপার ভেদাভেদ নাই, উচ্চশিক্ষা সকলেরই জন্য। ইহা প্রত্যেক পুরুষ ও রমণীর ঈপ্সিত ধন।

এক্ষণে আমাদের বিবেচ্য—নারীগণ কাহাদের নিকট হইতে এই শিক্ষা পাই-বেন? শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর নিকট? মার্কিণদেশে ইহার ভেদাভেদ নাই, পুরুষের নিকট নারী শিক্ষালাভ করিতে-

ছেন ও নারীর নিকট পুরুষ শিক্ষালাভ করিতেছেন এবং এই প্রণালীতেও শুভ-ফল দেখা গিয়াছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় এ দেশের নারীর শিক্ষা নারীর নিকটই পাওয়া উচিত, কারণ আমাদের দেশের নারীগণ সাধারণতঃ লজ্জাশীল ও লজ্জাই নারীর ভূষণ, পুরুষের নিকট শিক্ষালাভ করিতে তাঁহারা সঙ্কোচ বোধ করেন ও সকল বিষয় উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না। সে কারণ শিষ্যা ও শিক্ষয়িত্রীর সম্বন্ধের ব্যতিক্রম ঘটে। আমাদের দেশে আজ-কাল উচ্চশিক্ষিত-মহিলার অভাব নাই। প্রতিবৎসর বঙ্গমহিলার নাম graduate-দিগের ও master of arts-দিগের listকে শোভিত করিতেছে। এই সকল মহিলার মধ্যে যে সকলেই সংসার ধর্ম্ম করেন, তাহাও নহে। অথচ করিলেও কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। আমাদের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃ-পক্ষগণ যদি মহিলাদিগের স্কুলে কেবল শিক্ষিত মহিলাগণকে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষায় উৎসাহ দেওয়া হয় ও তাহার শুভ ফলও ফলিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, নারীগণকে যদি জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের কোমল ভাবগুলি চলিয়া যায় ও তাঁহারা পুরুষের ন্যায় কঠোরপ্রাণ হন। ইহা কোন কোন স্থলে সত্য বটে, কারণ দেখা যায় কোন কোন শিক্ষয়িত্রী ও অন্য কোন কর্ম্মক্ষেত্রের নারীগণ বহুকাল কর্ম্ম করিয়া শেষে উদ্ধত-প্রকৃতি ও নিষ্ঠুরস্বভাব হন। ঈশ্বর নারী-গণকে কোমল বৃত্তিগুলি এমন সুন্দর ভাবে দিয়াছেন যে, ঐরূপ অস্বাভাবিক বৃত্তি বিশিষ্ট নারী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সেকারণ নারীগণের আত্ম-নির্ভরতার পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃজন করা বিধেয় নহে। শিক্ষয়িত্রীর পদ যেরূপ মাননীয়, সেইরূপ দায়িত্বপূর্ণ, এইজন্য তাঁহাকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। মার্কিণ দেশে অনেক শিক্ষিতমহিলা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা আজীবন কুমারী থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কার্য্য করিয়া বা অন্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, নারী-জাতির উন্নতিকল্পে প্রচুর অর্থ দান করিয়া ত্যাগের আদর্শ-স্থানীয় হইয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

বামারচনা।

বসন্ত-আগমনী।

দ্রুত পদে, ম্লান মুখে, কম্পিত হিয়ায়
কুয়াসা, হিমানী, ওই মাগিছে বিদায়।

মরি কি অপূর্ব্ব জোতি
ছড়ায়ে রূপের ভাতি

নামিল বসন্ত ধীরে এ ভব ভবন,
ঢালিয়া মরত পুরে স্বর্গীয় কিরণ।
হে বসন্ত আনিয়াছ মৃতসঞ্জীবনী
তোমার পরশে ওই জাগিছে অবনী।
তরুণ মধুর হাসি,
আনন্দে উঠেছে ভাসি
আলোময়, দীপ্তিময়, ভরিয়াছে দেশ,
সাজিয়াছে বসুন্ধরা পরি নব বেশ।
ললিত সৌন্দর্য্যে মরি ভুবন ভরিয়া
সোনার বসন্ত তুমি এসেছ নামিয়া।
আপনি মা বসুমতী
রাখিয়াছেন কোল পাতি,
তারি পুণ্যফলে তব আগমন ভবে
তোমাকে মাখান সেই স্বর্গীয় সৌরভে।
ফল, পুষ্প, বৃক্ষ, যত তোমার কৃপায়
ধরিয়াছে চারু কান্তি নবীন পাতায়।
কুসুমে ভরিয়া ডালা
গাঁথিয়া প্রেমের মালা
পরে ঐ নব ভূষা শ্যামল বসন,
প্রকৃতি তোমারে যেন করিছে বরণ।
মৃদু মন্দ গন্ধ-লয়ে মলয় পবন
তব পদে উপহার করিছে অর্পণ।
মধুর মৃদুল বায়
কোকিলা পাপিয়া গায়
গুঞ্জরিছে মধুকর ফুলে ফুলে বসে
তোমারে আহ্বানে যেন সুমধুর ভাষে।
মধুর বসন্ত তুমি বড় সুধাময়
প্রেম-প্রীতি-ভরা তব প্রফুল্ল হৃদয়।
হেরিলে তোমারি মুখ
আনন্দে উথলে বুক
তোমার পরশে যেন আবার সংসার
আসিয়াছে নিয়ে নব শুভ সমাচার।
মরি কি মধুর রূপে ভরেছে ভুবন
যখন যে দিকে চাই জুড়ায় নয়ন।
নদ নদী আদি যত
নব ভাবে বিকশিত,
মৃদুল লহরী তুলি মৃদু মৃদু ধায়
অমৃত উচ্ছ্বাসে মরি বিশ্ব ভেসে যায়।
চারু হাসি ধরি চাঁদ শোভিছে গগন
তোমার সৌন্দর্য্যে দেখ হাসায় ভুবন,
সন্ধ্যা দেবী, উষারাণী
তব প্রেমে সুহাসিনী
দিগন্ত উজল করি নবীন আভায়
মন প্রাণ ঢেলে যেন তোমাতে মিশায়।
দিবাকর উঠে যবে সোণালী ছটায়
সুবিমল হাসি নিয়ে জগত মাতায়
তোমার সুন্দরতায়
উছলি উছলি ধায়।
মরি কি আশ্চর্য্য শোভা কিবা মনোহর
উঠে পড়ে কত তায় সৌন্দর্য্য লহর।
সুশোভিত করে তাই এ ভব ভবন
করিয়াছ পুলকিত মানবের মন।
তুমিই মানব-প্রাণে
নব নব সুধা-দানে
ভরিয়াছ নব ভাবে কি স্নেহ ধরায়
গড়িয়াছ ভগ্ন ধরা স্বর্গীয় শোভায়।
(অথবা)
সাজাতে ফুলের মালা হাসাতে কানন
স্বরগের দেব তুমি মরতে এখন
ছাড়ি এ সৌন্দর্য্য-রাশি
নিবায়ে মধুর হাসি
চলে যাবে অবশেষে স্বরগ-ভবন

পাঠাবে পোড়াতে বিশ্ব গ্রীষ্মের তপন।
চাই না গ্রীষ্মের রবি, শরতের শশী
বসন্ত! তোমায় তাই বড় ভালবাসি,
ছাড়িয়া অমরভূমি,
ধরাতলে থাক তুমি,
মানব হৃদয়ে নিতি জাগে ও বাসনা
মধুর বসন্ত তুমি যেও না যেও না।

শ্রীমনোরমা রায়।

বসন্তে।

ওহে ঋতুরাজ! কেন এলে আজ,
কোথা ছিলে সঙ্গোপন?
ডেকে ডেকে পাখী ভাঙ্গিয়া ছ গলা
পায় নাই তবু দরশন।
বিকশি প্রসূন গিয়াছে ঝরিয়া
নীরবেতে করি অভিমান,
গভীর নিশায় কাঁদিয়া প্রকৃতি
করে সিক্ত বিশ্ব উপাধান।
তবু ও তোমার গলেনি হৃদয়,
নিরদয় তুমি কি ভীষণ,
নব বেশে সাজি নব ভাব লয়ে
কেন আজি বল আগমন?
সাধের প্রেয়সী পিকরাণী বিনে
শোন না কি কারো আবাহন?
এত ডাকাডাকি, এত অনুরোধ,
তাই কি কর হেলা অনুক্ষণ?
প্রাণ খুলি পিক ডাকিবার আগে
ফুরাবার আগে তার গান,
বিরহ স্মরিয়া মিলনের তরে
উঠিল কি কেঁদে তব প্রাণ?
তাই আজি আর নারিলে রহিতে
সফল তারি মধুর তান।
এস ঋতুরাজ! মুক্ত ভব-কোষ
তোমারে করিতে আজি দান।
তোমারে লভিয়া ভুলেছে প্রকৃতি
মরমবেদনা আজি সব,
ভুবন ভরিয়া আহা কি মাধুরী
চারি দিকে কিবা হর্ষ-রব।
কাননে কাননে ফুলরাণী আজি
প্রেমভরে করে গলাগলি,
লাজ আবরণ কারো পড়ে খসি
আধেক ঘোমটা কেহ তুলি।
মিলন বারতা মলয়-পবন
দুয়ারে দুয়ারে করে দান,
পিকরাণী-তানে মিশায়ে সুস্বর
বিহঙ্গম করে সুধা গান।
প্রকৃতির যত ঘুচেছে অভাব
তোমারে লইয়া আজি ভোর,
চির মধুময়ে মানসে জাগিয়া
কৃতজ্ঞতা অশ্রু বহে মোর।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

"প্রার্থনা"।—

ওহে প্রভু দয়াময়,
জগতের পতি,
অপার করুণা তব
আমাদের প্রতি।
মোরা অতি দীনহীন
তোমার সন্তান
অজস্র করুণা তবু
করিছ প্রদান।—
মোরা অতি অল্পমতি
পাপেতে মলিন,
কেমনে বর্ণিব তোমা,
নাহি কোন জ্ঞান।
অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি,
করুণা-নিধান
অনন্ত তোমার লীলা
অসীম্ ভুবান্।—
এ জগতে প্রলোভনে,
পড়িয়া নিয়ত
করিতেছি কত পাপ
আমরা সতত।—
আমরা যে গো তোমার
দুর্ব্বল সন্তান,
নহে তব অবিদিত
ওহে ভগবান্।

মোরা নাহি জানি ধ্যান
অথবা ভজন,
কেমনে করিব তবে
ও গুণ কীর্ত্তন।
ভাই ভগ্নী পিতা মাতা
বন্ধু সহচর,
না চাহিতে সব তুমি
দিয়েছ মোদের।
এই ভিক্ষা মাগি আজি
করি এ মিনতি
নিত্য সত্য ব্রতে তব
কর মোরে ব্রতী।
তব বলে মোরা যেন
হয়ে বলীয়ান্
তোমারি পবিত্র পথে
হই আগুয়ান।
তোমারি দয়াল নামে
করিয়ে নির্ভর
বাধা বিঘ্ন দূরে ফেলি
হই অগ্রসর।
এই আশীর্ব্বাদ কর
মোদের উপর
ভক্তিভরে ও চরণে
করি নমস্কার।

---

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 620. April, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬২০ সংখ্যা। { চৈত্র, ১৩২১। এপ্রেল, ১৯১৫। } ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

চীনদেশীয় স্ত্রীলোক।

এসিয়া-মহাদেশের মধ্যে ভারতবর্ষের ন্যায় চীনও অতি প্রাচীন রাজ্য। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে চীনের নাম পাওয়া যায়। কাব্যশাস্ত্র-পাঠে চীনদেশীয় বস্ত্রের বিষয় জানিতে পারা যায়। আমাদের প্রাচীন তন্ত্র-সকলের মধ্যে "চীনাচারক্রম" নামে একখানি তন্ত্র আছে। ইহাতে বোধ হয় পূর্ব্বে ঐ দেশে হিন্দুধর্ম্মের প্রচলন ছিল। তবে ভারতবর্ষের আচার অপেক্ষা ইহাদের আচার কিছু ভিন্ন ছিল। খৃষ্ট-জন্মের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ভারত-বর্ষ হইতে এতদ্দেশে সমাগত প্রচারক-দিগের নিকটে ঐ দেশীয়েরা বৌদ্ধধর্ম্মের সার মর্ম্ম শুনিতে পায়। ৬০ খৃষ্টাব্দে চীন-সম্রাট্ "মাঙ্গতি" বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থসংগ্রহার্থ ভারতবর্ষে কয়েকজন লোক পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা একাদশ বৎসর এদেশে থাকিয়া পিটকাদি পুস্তক এবং বুদ্ধ-দেবের প্রতিমূর্ত্তি লইয়া যান। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফাইহান্ নামে একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক চীনদেশ হইতে ভারত-বর্ষে আসিয়া চৌদ্দ বৎসর এদেশে থাকেন এবং বিস্তর বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। সেই হইতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ক অভিজ্ঞতালাভ বহুলভাবে হইতে থাকে।

বৌদ্ধ মত এইরূপে প্রচারিত হইলেও সাকারোপাসনা এখনও পর্য্যন্ত ঐ দেশে প্রচলিত আছে। হিন্দুদিগের আচারের সহিত ঐ দেশের স্ত্রীপুরুষদের আচারও কিছু কিছু মিলে। চীনদেশের বিবরণ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য থাকিলেও এই প্রস্তাবে চীনদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিবরণই প্রধানভাবে এবং তৎসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ও সামান্য ভাবে বলা যাইতেছে।

আমাদের দেশে যেমন সন্তান না হইলে লোকে কার্ত্তিক, ষষ্ঠী, শিব, দুর্গা, নারায়ণ প্রভৃতি দেবতার নিকটে মানসিক করে, চীনদেশেও ঐরূপ পুত্রকামনায় লোকে দেবতাদিগের আরাধনা করিয়া থাকে। ঐ সকল দেবতার মধ্যে একটী দেবতার নাম কুন্তিন্। প্রবাদ এই, উক্ত নামে একজন বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী ছিলেন, তিনি মরিয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। দক্ষিণ চীনের লোকেরা বলে যে, ঐ দেশের সন্তানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর অনেক সহচরী আছেন। শিশু জন্মিলে তাহাকে স্নান করাইবার সময় এক সঙ্গিনী, শিশুকে হাসাইবার সময় এক সঙ্গিনী, শিশুকে স্তন্যপান করাইবার সময় আর এক সঙ্গিনীর প্রয়োজন হয়।

এই দেশের নারীগণ সন্তান-কামনায় কোন কোন দেবতার নিকট জুতা মানসিক করে। প্রথমে সন্তানকামনায় ঐ দেবতাকে জুতা দিয়া পূজা দিতে হয়। সন্তান হইলে আবার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ জুতা নিবেদন করিতে হয়।

চীনদেশীয় স্ত্রীলোকেরা পুত্রকামনায় আর এক প্রকার দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। প্রতিদিন রাত্রিতে স্ত্রী, স্বামীর বেশ ধারণ করিয়া, নিকটবর্ত্তী কূপবিশেষ তিন বার প্রদক্ষিণ করে। যদি বাটীর কেহ তাহাকে দেখিতে না পায়, এইরূপ অলক্ষিত ভাবে গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারে, তাহা হইলে মনে করে তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

সন্তান জন্মিয়া এক মাসের হইলে তাহাকে গৃহদেবতার নিকটে লইয়া গিয়া তাহার নামকরণ করা হইয়া থাকে। ঐ নামকে দুধের নাম বলে। আমাদের দেশে যেমন ছেলেদের খুদে, দুঃখে ইত্যাদি নাম রাখা হয়, অথবা কেহ কেহ এক হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যার শেষে কড়ি যোগ করিয়া নাম রাখে, যথা এককড়ি, দুইকড়ি ইত্যাদি, ঐ দেশেও বালকদের ঐরূপ দীনভাব-প্রকাশক কোন নাম রাখা হয়। ঐ দেশীয়েরা মনে করে যে, ঐরূপ খারাপ নাম রাখিলে ভূতেরা তাহাদিগকে ছুঁইবে না। বালিকাদিগের নাম রাখিবার সময় প্রায় ফুলের নামে নাম রাখা হয়। বিবাহের সময় পুরুষকে আবার নাম পরিবর্ত্তন করিতে হয়। বিবাহের পর হইতে সকলে চিরজীবন তাহাকে ঐ নামে অভি-হিত করে। মরিয়া গেলে আবার আর এক নাম রাখা হয়, ঐ নামে পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়গণ পিতৃলোকদিগের উদ্দেশে পূজাবিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

ছেলেরা যতদিন হাঁটিতে না শিখে, ততদিন তাহাদিগকে দুধ ভিন্ন আর কিছু খাইতে দেওয়া হয় না। হাঁটিতে শিখিলে অল্প অল্প করিয়া ভাত খাইতে অভ্যাস করান হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে যেমন ছেলে কোলে করা হয়, চীনদেশে ঐরূপে কোলে রাখা হয় না, সেখানে প্রায়ই পিঠে করিয়া ছেলে রাখার নিয়ম। কোন চাকর, চাকরাণী মনিবের ছেলেদিগকে লইয়া বেড়াইতে যাইবার সময় পিঠে বাঁধিয়া লইয়া যায়।

দরিদ্র-স্ত্রীলোকেরা ন্যাকড়া দিয়া ছেলেকে পিঠে বাঁধিয়া লইয়া সাংসারিক কাযকর্ম্ম করে।

ছেলেরা হাঁটিতে শিখিলেই মধ্যে মধ্যে তাহাদের মাথা কামাইয়া মাথার ঠিক মধ্যস্থলে শিখা রাখিয়া দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকদিগের কেশবিন্যাসের রীতি চীনের এক এক প্রদেশে এক এক প্রকার। কোন কোন দেশে বালিকা-দিগের চুলগুলি মস্তকের পশ্চাৎ দিকে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। আবার কোন কোন প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা খোপার সহিত চুল জড়াইয়া রাখে। বিবাহের পূর্ব্বে বালিকাদিগের চুল আল্‌গা থাকে, বিবাহের দিন বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

বালিকাদিগের গায়ে পরিমিতসংখ্যক ভূষণ পরাইয়া দেওয়া হয়। চীনদেশীয় স্ত্রীলোকেরা অত্যধিক আভরণ ব্যবহার পছন্দ করেন না। আমাদের দেশে যেমন সাচ্ছাদনালঙ্কৃতা কন্যাকে পাত্রসাৎ করি-বার নিয়ম আছে, চীনদেশেও তেমনি বিবাহের সময় কন্যাদিগকে বসনভূষণে সজ্জিত করিয়া দেওয়া হয়। চীনের কোন কোন প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা গায়ে তৈল হরিদ্রা মাখে। কেহ কেহ বা মুখে রং ও সাদা পাউডার মাখে।

চীনদেশের স্ত্রীলোকদিগের ক্ষুদ্র পদ বিশেষ প্রশংসনীয়। বালিকাদিগের বয়স যখন পাঁচ বৎসর হয়, সেই সময় হইতে তাহাদিগের পা কিসে ছোট হইবে, তাহার উদ্যোগ করা হয়। সেই উদ্যোগ হইতেই তাহাদিগের পা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। দুই পায়ের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি মাত্র সোজা রাখিয়া, অবশিষ্ট অঙ্গুলিগুলি দুমড়াইয়া পায়ের তলার দিকে আনিয়া বাঁধিয়া দেওয়া ও নেকড়া জড়াইয়া সেলাই করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে পনর দিন ত যাতনার এক-শেষ হয় এবং এক বৎসর পর্য্যন্ত ঐ যাতনা থাকে। শীতকালে কম্বল প্রভৃতি ধারণে পা অত্যন্ত গরম হয়, গ্রীষ্মকালেত পা স্বভাবতঃই গরম থাকে। গরম হইলেই ক্রমশঃ যাতনা বাড়ে। বালিকারা ঐ নিদারুণ যাতনায় অস্থির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে। ঐ দৃশ্য বড়ই ভয়ানক। কোন কোন বালিকার বা দুই একটী অঙ্গুলি খসিয়া পড়িয়া যায়।

ঐরূপ ছোট পা দিয়া তাহারা খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলে। চীনদেশীয় কবিগণ তাহাদিগের ঐরূপ পদবিক্ষেপকে হংস-গমনের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা ঐরূপ খোঁড়াইয়া চলিতে কষ্টবোধ করেন। তাঁহারা দাসীর বা অন্য কাহারও স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া চলেন। চীনদেশীয় সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই ঐরূপ পা ছোট করিবার নিয়ম আছে। কিন্তু দরিদ্রজাতীয় স্ত্রীলোক-দিগকে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, সুতরাং তাহাদিগের ঐরূপ পা ছোট করিলে চলে না।

চীনদেশের সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যাদিগের যখন বিবাহের সম্বন্ধ আইসে, তখন বর-পক্ষীয় মাতা প্রভৃতি স্ত্রীলোক প্রথমে

জিজ্ঞাসা করেন যে, মেয়েটী বুদ্ধিমতী কি না, লেখাপড়া ভাল জানে কি না, কাযকর্ম্ম ভাল জানে কি না? প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয়—"পা-ছুখানি খুব ছোট ত"? যদি ঘটকের নিকটে শুনে যে, পা খুব ছোট, চলনটী যেন ঠিক হংসগমনের ন্যায়, তবে কন্যায় মাতার খুব প্রশংসা হয়। বিবাহের পরে নববধূর পা-ছুখানি দেখিয়া যদি শাশুড়ী সন্তুষ্ট হন, তবে খুব আনন্দের সহিত বলেন যে, 'বুদ্ধিমতী মায়ের মেয়ে বটে। মা বেশ যত্ন করিয়া মেয়ের পা ছোট করিয়া দিয়াছে'।

চীনদেশে অল্প বয়সেই বালক-বালিকাদিগের বিবাহ হয়। ২০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সচরাচর সন্তান জন্মিয়া থাকে। কন্যাপক্ষীয় অভিভাবককে পণ দিয়া পুত্রের বিবাহ দিতে হয়। বালিকার বয়ঃক্রমানুসারে পণও কম বেশী হইয়া থাকে অর্থাৎ কন্যার বয়স কম হইলে পণ কম, এবং বয়স বেশী হইলে পণ বেশী দিতে হয়।

ঘটকেরা এদেশে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন। প্রথমে ঘটক মহাশয় কন্যাপক্ষীয়দিগের নিকটে বিবাহের প্রস্তাব জানাইলে কন্যার অভিভাবক যদি ঐ বরে কন্যা সম্প্রদান করিতে মনঃস্থ করেন, তবে তাহা বরকর্ত্তাকে জানান। তৎপরে বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার নিকটে কিছু উপহার পাঠান। তাহার পর গণক দ্বারা বর ও কন্যার কুষ্ঠি দেখাইয়া বিবাহ হইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করা হয়। বিবাহ হইবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষের বাগ্‌দান হয়। সম্বন্ধ স্থির হইবার পর তিন দিনের মধ্যে যদি বরের বা কন্যার গৃহে চুরী হয়, বা কোন মূল্যবান্ জিনিষ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে আর সে বিবাহ হইতে পারে না।

বাগ্‌দানের পর বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ দেখিতে না পায়, এইজন্য কন্যাকে অন্তঃপুর হইতে আর বাহিরে আসিতে দেওয়া হয় না। গণকেরা বিবাহের শুভ দিন স্থির করিয়া দিলে বরপক্ষীয় নির্ব্বাচিত কতকগুলি লোক কন্যাকে আনিতে যায়। ঐ কন্যানয়নব্যাপারে ভূতেরা কোন বিঘ্ন না জন্মাইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে ঐ দেশের চিরাচরিত নিয়মানুসারে দলের অগ্রগমনকারী লোক শূকরের মাংস হস্তে করিয়া লইয়া যায়। এইরূপে বরপক্ষীয়গণ কন্যাকর্ত্তার ভবনে গিয়া কন্যাকে লইয়া আইসেন।

কন্যা বরকর্ত্তার বাড়ীর নিকটে পঁহুছিলে তাহাকে দোলা হইতে অবতরণ করান হয়। পরে দুইজন পুরন্ধ্রী (অর্থাৎ পতিপুত্রবতী স্ত্রী) আসিয়া কন্যাকে লইয়া যান। কন্যাকে গৃহে যাইবার সময় সমীপবর্ত্তী পাত্রস্থ অগ্নি ডিঙ্গাইয়া যাইতে হয়। কন্যা বরের গৃহে আসিয়া চৌকিতে উপবিষ্ট বরকে প্রণাম করে। বর তখন চৌকি হইতে উঠিয়া আসিয়া কন্যাকে চৌকির উপর লইয়া যায় এবং ঘোমটা খুলিয়া কন্যার মুখ দেখে। পরে উভয়ে চৌকিতে গিয়া বসে। বসিবার সময়

পরস্পরকে পরস্পরের কাপড় চাপিয়া বসিতে হয়। উভয়ের ঐরূপ উপবেশন বিষয়ে চীনবাসীদের ধারণা এইরূপ যে, যে যত কাপড় চাপিয়া বসিতে পারিবে, সাংসারে তাহার তত কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। এইরূপে কাপড় চাপিয়া বসার কিছুক্ষণ পরে তাহারা সমীপবর্ত্তী কক্ষে গিয়া দেবলোকের ও পিতৃলোকের উপাসনা করে। পরে তাহারা পুনরায় আপন গৃহে আসিলে বর ভোজন করে, কন্যার সেদিন ভোজন করা নিষিদ্ধ বলিয়া কন্যা খায় না। আহার হইয়া গেলে উভয়ের হস্তে সুরাপাত্র দেওয়া হয়। উহারা সুরা স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করে যে, চিরজীবন বিশ্বস্ত ভাবে থাকিয়া গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে।

তাহারা ঐ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে না বলিয়া তাহাদের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধও বিচ্ছিন্ন হয় না। স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিলে স্বামী আর দারপরিগ্রহ করিতে পারে না। কিন্তু যদি স্ত্রী শ্বশুর শাশুড়ীর অবাধ্য হয়, ব্যভিচারিণী, হিংস্রস্বভাবা, চৌর্য্যশীলা হয়, এবং বন্ধ্যা ও কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হয়, তবে স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিলেও স্বামী পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে।

স্বামী মরিয়া গেলে ভদ্র গৃহস্থের স্ত্রীলোকেরা আর বিবাহিতা হন না, কিন্তু ইতর জাতির এবং দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ পুনর্ব্বার স্বামী গ্রহণ করে। হিন্দুসমাজের ন্যায় চীনসমাজেও বিধবা-বিবাহ অত্যন্ত নিন্দিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরলোকে পতির সহিত মিলিত হইবে, এই ধর্ম্মবিশ্বাসে ঐ দেশের অনেকে বিধবা হইয়া আত্মহত্যা করে। ঐরূপ আত্মহত্যা ঐ দেশের সমাজে প্রশংসার কার্য্য।

বিবাহের পর স্ত্রীলোকেরা গুরুজনের বাধ্য হইয়া দক্ষতার সহিত গৃহকার্য্য করে এবং গৃহদেবতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে। গৃহস্থের বাড়ীতে অনেক দেবতা আছেন, কোন কোন দেবতা বা মঠ প্রভৃতিতেও থাকেন। চীনদেশের দেবতা অনেক। চীনদেশীয়েরা ধনকামনায় যে দেবতার অর্চ্চনা করে, তাহার নাম "যুয়েন্‌তন্‌"। বোধ হয় আমাদের "কুবের" যেমন ধনরক্ষক, ঐ দেশের "যুয়েন্‌তন্‌" তেমনি। তৎসম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, তিনি পূর্ব্বে কৃষ্ণবর্ণ ব্যাঘ্রে চড়িয়া একটী মুক্তা হস্তে করিয়া বেড়াইতেন। ঐ মুক্তা মাটীতে ফেলিয়া দিলে ফাটিয়া যাইত। তিনিই মরিয়া ধনাধিপতি হইয়াছেন। আর একটী দেবতা ঐশ্বর্য্যদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে যেমন ইন্দ্র, বোধ হয় ঐ দেশে ঐশ্বর্য্যদেবও তেমনি। উক্ত ঐশ্বর্য্যদেবের আবার দুইজন মন্ত্রী আছে। তাঁহাদের একের নাম ধনাগম, অপরের নাম লাভদাতা। ধনাগম বোধ হয় আমাদের দেশের লক্ষ্মীর ন্যায় কোন পুংদেবতা এবং লাভদাতা, বোধ হয়, আমাদের দেশের সিদ্ধিদাতা গণেশের ন্যায় দেবতা হইতে পারেন। কারণ, আমাদের দেশের দোকানদারেরা যেমন গৃহমধ্যে গণেশের মূর্ত্তি রাখে ও

দুই বেলা বাতি ধূপ দেয়, চীনদেশীয় দোকানদারেরাও তেমনি লাভদাতা দেবতার নিকটে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা-কালে ধূপ ও বাতি দেয়। আমাদের দেশেও লক্ষ্মীপূজার দিনে লক্ষ্মীপূজার সহিত কুবের ও ইন্দ্রের পূজা হয়। আমাদের দেশের ন্যায় চীনবাসী স্ত্রী-পুরুষেরাও ঐশ্বর্য্য ও সিদ্ধিলাভের জন্য ঐ সকল দেবতাকে মানসিক করে। চীন-দেশের প্রত্যেক রন্ধনশালায় এক একটী মূর্ত্তি থাকে, তাহা প্রধানতঃ রন্ধনশালার দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রতিমাসে দুই বার ঐ দেবতার পূজা হয়। বৎসরান্তে ঐ দেবতার মূর্ত্তি বদলাইয়া আবার নূতন মূর্ত্তি স্থাপন করা হয়। পরিবারস্থ লোক-দিগের মধ্যে যিনি যে পাপ পুণ্য করুন না কেন, ঐ দেবতা তাহার হিসাব রাখেন এবং বৎসরের শেষে স্বর্গে যাইয়া পরিবারস্থ প্রত্যেক লোকের পাপপুণ্যের কথা ঈশ্বরকে জানান। এই বিশ্বাসে বৎসরের শেষ মাসে উক্ত দেবতাকে বিবিধ প্রকার মাংস, ফল, সুরা ইত্যাদি উপহার দিয়া পূজা করা হইয়া থাকে। স্বর্গে গিয়া যাহাতে ভগবানের নিকটে সকলের ভাল কথা বলেন, এইজন্য যাত্রাকালে উক্ত দেবতার মুখে চিনি ঘসিয়া দেওয়া হয়। ঐ দেবতা কিসে চড়িয়া স্বর্গে যাইবেন, তাঁহার বাহনের প্রয়োজন। তদুদ্দেশ্য-সাধনার্থ চীনবাসীরা কাগজের ঘোড়া প্রস্তুত করিয়া তাহা আগুনে জ্বালিয়া ঐ দেবতার উদ্দেশে উপহার দেয়। ভূত-প্রেতেরা ঐ দেবতার স্বর্গগমনে বাধা জন্মাইতে পারে, এইজন্য বাজি পোড়াইয়া তাহাদিগকে ভয় দেখান হয়। রন্ধন-শালায় এই মূর্ত্তি থাকে বলিয়া স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা এই মূর্ত্তিকে দেখিতে পায় ও অত্যন্ত সম্মান করে।

চীনদেশের রন্ধনশালা তাম্বুর মত ও একতালা। সেখানে সকল শ্রেণীর ঘরই এইরূপ। রন্ধনগৃহ হইতে ধূম নির্গত হওয়ার জন্য গবাক্ষ আছে।

আমাদের দেশের ন্যায় চীনদেশীয় লোকেরাও ভাত খায়। ঐ দেশের উত্তরাঞ্চলে এক প্রকার শস্য জন্মে। আমাদের দেশে যাহাকে চীনা বা জনার বলে, উহা সেই ঘাস। বোধ হয়, চীনদেশ হইতে প্রথমে উহা এদেশে আনীত হইয়া-ছিল বলিয়া উহার নাম চীনা হইয়া থাকিবে। উত্তরচীনের দরিদ্র লোকেরা ঐ শস্যের অন্ন ভক্ষণ করে। এই দেশীয় লোকদিগের মধ্যে আমিষ ও নিরামিষ-ভোজী উভয় শ্রেণীর লোকই আছে, কিন্তু তন্মধ্যে আমীষভোজীর সংখ্যাই অধিক। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকল শ্রেণীর মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে মৎস্যভক্ষণের রীতি আছে। শূকর, ভেড়া, ছাগল, কুক্কুট, রাজহংস ইত্যাদির মাংস এদেশের প্রধান খাদ্য।

ঐ দেশের রীতি অনুসারে কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, সকলেই ছোট একখানি টেবেলে ভাত রাখিয়া খায়। টেবিলের মধ্যে কোন একটী বড় পাত্রে খুব গরম

ভাত থাকে। তাহার চারি দিক্কার ভিন্ন ভিন্ন বাটিতে মংস্য ও মাংসের ঝোল, চর্চ্চড়ি, অম্বল ইত্যাদি রাখে। এইরূপে অন্ন ব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া লইয়া তাহার চারি দিকে চেয়ারে, ছোট ছোট টুলে বা ঐরূপ কোন আসনে স্ত্রীলোকেরা খাইতে বসিয়া যায়। আমাদের দেশের ন্যায় ইহারা হাত দিয়া খায় না এবং ইউরোপবাসীদিগের ন্যায় চামচ দিয়া তুলিয়াও খায় না। তাহারা সজারুর কাঁটার মত কাঠের এক প্রকার কাটি দিয়া খায়। খাইবার সময় দক্ষিণ হস্তের প্রথম তিন অঙ্গুলি দিয়া ঐরূপ দুই গাছি কাটি ধরে। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের কাছে একখানি করিয়া বাসন ও এক জোড়া করিয়া ঐরূপ কাটি থাকে। অন্ন-পাত্র হইতে গরম ভাত বাসনে ঢালিয়া একটু নাড়িয়া লয়, বাসনখানি বাঁ হাতে মুখের কাছে ধরিয়া ঐ দুই গাছি কাটি দিয়া খুব শীঘ্র শীঘ্র ভাত মুখে তুলিয়া লয়। ভাত মুখে দিয়া তাহারা পৃথক্ পৃথক্ পাত্র হইতে চর্চ্চড়ি প্রভৃতিও কাটি দিয়া মুখে তুলিয়া লয়। ইহাই তাহাদের খাইবার সাধারণ নিয়ম।

চীনদেশের লোকেরা প্রায়ই শীতল জল পান করে না। জল গরম করিয়া খায়। যে যে স্থানে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায় না, সেই সেই স্থানে গরম জল খাওয়াই ভাল। বোধ হয় চীনদেশে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায় না, অথবা সকল প্রকার জলই গরম করিয়া খাইলে উহার উপকারিতা জন্মে, এই জন্যই ঐরূপ নিয়ম হইয়া থাকিবে। এই দেশে চা পানের ব্যবহার খুব বেশী, পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও চা খাওয়ার রীতি আছে। আমাদের দেশের ন্যায় ইহারা দুধ দিয়া চা খায় না। প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে সমস্ত দিনই গরম জল থাকে। যাহার যখন চা খাওয়ার প্রয়োজন হয়, বাটিতে কতকগুলি চায়ের পাতা দেয় ও তাহার পর তাহাতে গরম জল ঢালিয়া কিছুক্ষণ ঢাকিয়া রাখে, তাহাতে উত্তম চা প্রস্তুত হয়। ঐ চাতে তাহারা কিছু মিশায় না, শুধু চা খায়।

এই দেশে প্রচুর পরিমাণে চা জন্মে। চীনদেশের স্ত্রীলোকেরা চুবড়ীতে করিয়া চার পাতা তুলে। ঐ পাতাগুলি প্রথমে রৌদ্রে শুকায়, পরে বড় কড়ায় ঐগুলি ভাজিয়া হাতে চটকাইয়া মুড়িয়া লয়। তৎপরে বাক্সে করিয়া পারস্য, আরব, রুশ, আফগানিস্থান ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ঐগুলি চালান দেওয়া হইয়া থাকে।

চীনদেশের রেশমও অতি বিখ্যাত। প্রবাদ এই,—চীনদেশের কোন সাম্রাজ্ঞী সর্ব্বপ্রথমে রেশম হইতে সূতা কাটিয়া লইয়া তাহা দিয়া কাপড় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য প্রতি বৎসরের নবম মাসে ঐ রাণীর উদ্দেশে পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঐ দেশের রাজা কোমরে লাঙ্গল দিয়া চাষ করেন,

এবং দাসী-সহচরীদিগের সহিত তুঁতের পাতা তুলেন। এইটী ঐ দেশের নিয়ম। বোধ হয়, কৃষিবিষয়ে দেশীয় স্ত্রীপুরুষদিগকে আদর্শ ও উৎসাহ দানের জন্য ঐ নিয়ম হইয়া থাকিবে। ঐ দেশের অনেক দরিদ্র বালক বালিকা পর্য্যন্ত রেশমের কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

চীনদেশের লোকসংখ্যা পৃথিবীর সকল দেশের অপেক্ষা অধিক, এই জন্য জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ইহাদিগকে যথেষ্ট শ্রম করিতে হয়। পূর্ব্বকাল হইতে ইহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কার্য্যকুশল। চীনদেশীয় বিখ্যাত প্রাচীর তাহার এক বিশেষ নিদর্শন। এই দেশে সর্ব্বপ্রথমে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। ঐ দেশীয়েরা উত্তম রেশমী বস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারে বলিয়া প্রাচীনকাল হইতে ঐ বিষয়ে চীনের খ্যাতি আছে। চীনে মাটীর দোয়াত ও চীনে মাটীর বাসন, এ দেশের সকলেই দেখিয়াছেন। ইহারা খোদাই কার্য্য এবং চিত্ররচনাতেও বিশেষ নিপুণ। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও অনেকে অনেক প্রকার শিল্পকার্য্য জানে।

ঐ দেশের ভাষা অত্যন্ত কঠিন। শুনা যায় ঐ ভাষার বর্ণমালা নাই। ২১৮ মূল শব্দ বা ধাতু আছে। ঐগুলি রূপান্তর করিলে অনেক পদ হয়। এই ভাষা কঠিন বলিয়াই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, এদেশে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার ব্যবহার অত্যন্ত কম। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন, এক সহস্র স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন উত্তমরূপে পড়িতে ও লিখিতে পারেন।

শ্রীঅভিলাষ চন্দ্র সার্ব্বভৌম, কাব্যপুরাণতীর্থ।

বারাণসীতত্ত্ব।

সপ্তম অধ্যায়।

ভেলুপুরা মহল্লা।

নগরের দক্ষিণভাগ ভেলুপুরা নামে খ্যাত। স্থানটী মিউনিসিপালিটি-ভুক্ত। ইহার নদীসম্মুখস্থ স্থানটী ইষ্টকনির্ম্মিত এবং অবশিষ্টাংশ ফাঁকা। আবাসভূমির চতুর্দ্দিকে বিশেষরূপে চাষ হইয়া থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণাবস্থিত খজুয়া এবং নবাবগঞ্জ নামক মহল্লা ব্যতিরেকে পল্লিটীর কোন স্থানেই লোকসংখ্যা অধিক নহে। এখানকার অধিবাসীরা জাতিতে হিন্দু, কিন্তু শিবালয়ের সন্নিকটে বহুসংখ্যক মুসলমানেরও বাস। দিল্লীরাজের বংশধরগণ এবং তাঁহাদিগের অনুচরবর্গ এই স্থানে বাস করেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে তুলসীঘাটের নিকটবর্ত্তী স্থানে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ এবং মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রায়ই বাস করেন। উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে দুইটী

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব দিকে অসি শড়ক এবং পশ্চিম দিকে দুর্গাকুণ্ড বা ভেলুপুরা-রাস্তা অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত রাস্তাটি অসি ও গঙ্গাসঙ্গমের নিকট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সন্নিকটে বারাণসী ক্ষেত্রের Water-worksএর প্রধান আড্ডা। রাস্তাটী অসি, ভদাইনি এবং শিবালয় মহল্লার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই স্থানে উকীল এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের আবাস-গৃহ এবং উদ্যান। ইহার সান্নিধ্যে হিঙ্গিয়া তালাও নামক একটি বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল, কিন্তু তাহা এখন বুজাইয়া ফেলা হইয়াছে। তালাওয়ের উত্তর দিকের রাস্তাটি ঘন আবাস ভূমির ভিতর দিয়া গিয়া সুবৃহৎ বাঙ্গালীটোলা ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাম-নগরের বিপরীত দিকে ঘোরা ঘাট হইতে ভেলুপুরা রাস্তার আরম্ভ। ইহার দুই পার্শ্বে ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের অট্টালিকা অবস্থিত, তন্মধ্যে মির্জ্জাপুরের অগোরী বড়হারের রাণীর প্রাসাদটী দেখিবার বস্তু। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রসিদ্ধ দুর্গাকুণ্ড অবস্থিত। এখানে বানরগণ দলে দলে বিচরণ করিয়া থাকে। যাত্রিগণ তাহাদিগকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করে বলিয়া তাহাদিগের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেন যে এখানে বানরের এত সেবা হইয়া থাকে, তাহা বলা দুঃসাধ্য। দুর্গাকুণ্ডের সহিত বানরদিগের কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। রামের মন্দির অথবা হনুমানের মন্দির হইলে বানর-সেবার কতকটা যুক্তি থাকিতে পারিত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা কিছু দেখা যায় না। এখানকার মন্দিরে যে দুর্গামূর্ত্তি আছে, তাহা বাঙ্গালী রাণীর দ্বারা স্থাপিত। মূর্ত্তির শিল্পপারিপাট্য নাই। দুর্গা মহাদেবের স্ত্রী। শাস্ত্রে ইনি শক্তিভূতা সনাতনী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মূর্ত্তির নীচে মহিষাসুর পতিত। দানবগণ যখন দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করে, তখন দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেবের আদেশে দুর্গাদেবী অসুর-মর্দ্দনের ভার লয়েন। পূর্ব্বে এই স্থানটি নগরের মধ্যে ছিল। আধুনিক অট্টালিকাটি সুবিখ্যাত রাণী ভবানী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইহার সংলগ্ন উত্তর দিকে একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। ইহার পূর্ব্ব দিকে অসিঘাট-প্রস্থিত শাখা-শড়কে কুরুক্ষেত্র-তালাও নামে একটী পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। রাণী ভবানীই এই পুষ্করিণী খনন করান। জলাশয়টী চতুষ্কোণ এবং ইহার সোপানাবলী প্রস্তরনির্ম্মিত। সূর্য্যগ্রহণের সময় এখানে বহু স্নাতকের সমাগম হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্র-তালাওটী ভাদিনী মহল্লায় অবস্থিত। এখানে নানকসাহি-উদাসী-সম্প্রদায়ের "পঞ্চায়তি কলা" নামে একটী আখাড়া আছে। নানকরাম নামে নিজামের জনৈক কর্ম্মচারী ১৭৯০ খৃঃ অব্দে এই আখাড়াটী স্থাপন করেন এবং তাহার পরিচালনের জন্য প্রচুর অর্থ রাখিয়া যান। উক্ত আখাড়ার বহু স্থানে জমিদারী

আছে। মঠটীর বার্ষিক আয় দশ সহস্র মুদ্রা। ইহার শাখা এলাহাবাদ, হরিদ্বার, গয়া, নাসিক, উজ্জয়িনী, পাটিয়ালা এবং বৃন্দাবনে দৃষ্ট হইয়া থাকে। দুর্গাকুণ্ডের সন্নিকটে মেলারাম আখাড়া অবস্থিত। ইহা ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক যোগীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে। এলাহাবাদ, অমৃতসর, জব্বলপুর এবং পাটনায় ইহাদিগের শাখা আছে। তৃতীয় আখাড়াটির নাম কিনারাম। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে জনৈক রাজপুত দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সদস্যগণ অঘোর-পন্থী। হিন্দু ও মুসলমানদিগের হস্তের পাক আহার ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত। দুর্গাকুণ্ডের পশ্চিমে নবাবগঞ্জ এবং খজুয়ার বৃহৎ কাচ্চা বাজার অবস্থিত। শেষোক্তটীতে শস্য বিক্রয় হইয়া থাকে এবং রং করা বারাণসীর খেলানা এইখানেই পাওয়া যায় বলিয়া স্থানটী প্রসিদ্ধ। দুর্গাকুণ্ডের উত্তরে একটী রাস্তা ওয়াটার ওয়ার্কস্ এবং জৈন মন্দিরের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। এই মন্দিরটী পরেশনাথের জন্মস্থানের চিহ্ন। পরেশনাথ একজন তীর্থঙ্কর ছিলেন। এখান হইতে রাস্তাটী উত্তর-পশ্চিম দিকে সিগ্রা অভিমুখে Central Hindu College অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। নিকটে ভিঙ্গা রাজার অতিথিশালা বিদ্যমান। ভেলুপুরার শেষ সীমায় লক্ষ নামক রাস্তা বিরাজিত। এই রাস্তাটী গোদৌলিয়া চৌক হইতে "মার বাড়ী" পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভেলুপুরার মূল রাস্তা রেউড়ি গলির বিপরীতে পুলিস-ষ্টেসনের উত্তর দিক হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং রাজা জয় নারায়ণ নামক মিসনরী কলেজের নিকট দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়।

দশাশ্বমেধ মহল্লা।

ভেলুপুরার উত্তর দিকে দশাশ্বমেধ মহল্লা। ইহার পূর্ব্ব দিকের অংশটি পাকা। দশাশ্বমেধ-ঘাটের দক্ষিণের কিয়দংশ বাঙ্গালিটোলা নামে খ্যাত। এখানকার অধিবাসিগণ অধিকাংশ বাঙ্গালি। পশ্চিম দিকের অর্দ্ধাংশ অপেক্ষাকৃত ফাঁকা এবং উত্তমোত্তম অট্টালিকা ও উদ্যান দ্বারা পূর্ণ। অধিবাসীর মধ্যে অর্দ্ধাংশ বাঙ্গালি এবং অবশিষ্ট মুসলমান, জুলাহা ও অন্যান্য হিন্দুবর্গ। এই মহল্লার প্রধান রাস্তা দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে গোদৌলিয়া পর্য্যন্ত গমন করিয়া অসি এবং চৌক রাস্তার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এখান হইতে সেই রাস্তা আবার পুরতঃ অগ্রসর হইয়া ভেলুপুরার রাস্তার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালিটোলা অসি-রাস্তা এবং নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। সমুদায় স্থানটী পাকা ও সত্রনিচয় দ্বারা পূর্ণ। এখানে "জঙ্গমবারী উরী" মঠ অবস্থিত। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মানস-সরোবর নামে একটী পুষ্করিণী আছে। ইহার চতুষ্পার্শ্বে রাজা

মানসিংহের মন্দির দ্বারা বেষ্টিত। অন্যান্য মহল্লা অপেক্ষা এখানে পবিত্র স্থানের সংখ্যা অধিক। এখানকার রাম ও লক্ষ্মণের মন্দিরটি খুবই প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের সীমার মধ্যে দত্তাত্রেয়ের মূর্ত্তি আছে ইনি অত্রি ঋষির পুত্র। দুর্ব্বাসা এবং চন্দ্র ইহাঁর ভ্রাতা। মানস-সরোবরের পূর্ব্ব-দিকস্থ দ্বারে দুইটি বহু পুরাতন মূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে একটি বেদীর উপর দণ্ডায়মান ও অন্যটি বাটীর প্রাচীরে সংলগ্ন। প্রথম মূর্ত্তিটী বালকৃষ্ণ এবং অন্যটি চতুর্ভুজ। মানস-সরোবরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি বৃহৎ বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। ইনি তিলভাণ্ডেশ্বর নামে খ্যাত। ইহার শরীরের বেড়টি অন্যূন ১৫ ফিট এবং উর্দ্ধে ইনি ৪॥ ফিট। লোকের বিশ্বাস ইনি প্রত্যহ তিল তিল করিয়া বর্দ্ধিত হন। এই জন্যই ইহার নাম তিলভাণ্ডেশ্বর। মন্দিরটি উচ্চ চত্বরের উপর অবস্থিত। চত্বরের উপরে আরোহণ করিতে হইলে সিঁড়ি দ্বারা যাইতে হয়। প্রস্তরনির্ম্মিত একটি ষণ্ডমূর্ত্তি সম্মুখে অবস্থিত। তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দিরের দ্বারের দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঠাকুর-দোয়ারা আছে, তাহাতে অনেকগুলি মূর্ত্তি আমাদের নয়নপথের পথিক হয়। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে "সামাকার্ত্তিক" নামে একটি বিগ্রহ আছে। এই নামের দেবতা বারাণসী ধামে আর নাই। পূর্ব্ব দিকে একটি বিষ্ণু-পাদপদ্ম বিরাজিত। এতদ্ব্যতীত তিনটি সর্পদেবতা, মহাদেবের ত্রিমূর্ত্তি এবং গণেশের মূর্ত্তি আছে। তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দিরের সন্নিকটে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে বীরভদ্রের ভগ্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তিটি প্রকাণ্ড, কিন্তু ঔরঙ্গজেব দ্বারা চূর্ণীকৃত। অসি এবং দশাশ্বমেধ রাস্তার সঙ্গম-স্থানের অট্টালিকাগুলি অতি কুৎসিৎ, কিন্তু ধনাঢ্য বাঙ্গালিদিগের দ্বারা গঠিত উত্তমোত্তম অট্টালিকা দ্বারা স্থানটি ক্রমশঃ মনোরম হইতেছে। দশাশ্বমেধ রাস্তার উত্তরে এবং চৌকরাস্তা ও ঘাটের মধ্যে যে স্থান তাহা "তেহরি নীম" নামে খ্যাত। এখানকার অট্টালিকাগুলি পাক্কা। অনেকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত বাটী ও মন্দির এই স্থানটীর শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে লহনাসিংহের বৈঠক নামক একটী সুন্দর মন্দির, পুরাতন গোঁসাই মঠ এবং কাশ্মিরের মহারাজ দ্বারা পরিচালিত একটী সুবৃহৎ সত্র উল্লেখযোগ্য। চৌক রাস্তার পশ্চিমে হওজকটরা মহল্লার একটী বাজার এবং দশাশ্বমেধের পুলিস থানা অবস্থিত। দশাশ্বমেধ-ঘাটের সন্নিকটে আর একটি বড় বাজার আছে। এখানে মৎস্য এবং শাক-শব্জি বিক্রয় হইয়া থাকে। এই বাজারের ক্রেতৃগণ সকলেই বাঙ্গালী। বাজারে কিরূপ জনতা হয়, তাহা প্রাতঃ-কালে আসিয়া দেখিলে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। পশ্চিম দিকে চৌক এবং লক্ষ রাস্তার মধ্যবর্ত্তী পান-দরিয়া নামক একটি প্রধান পান বাজার

আছে। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের সন্নিকটে লক্ষ্মীকুণ্ড নামে একটী পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ৮ই ভাদ্র হইতে ৮ই আশ্বিন পার্য্যন্ত সূর্য্য-মেলা হইয়া থাকে। হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে, বিশেষতঃ মহিলাগণ উক্ত কুণ্ডে স্নান করেন এবং লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে গিয়া পূজা করিয়া থাকেন। মেলার শেষ দিনে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। কুণ্ডের দক্ষিণে অসি এবং ভেলুপুরা রাস্তার মধ্যে মদন-পুরা নামক স্থান অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা বহুলাংশে তন্তুবায়। ইহারা জুলাহা নামে খ্যাত। জেইতপুরার মোওয়ালাজদিগের সহিত ইহাদিগের পার্থক্য আছে। গোদোলিয়া নামক স্থানে একটি গির্জ্জাঘর দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে "লক্ষ" রাস্তা পশ্চিমবাহিনী হইয়া মিশনরী পোখরাকে অতিক্রম করতঃ চলিয়া গিয়াছে। ইহার অনতিদূরে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের উত্তরে থিওসোফিকেল সোসাইটির কামক্ষা নামক আড্ডা অবস্থিত। উল্লিখিত রাস্তার পরেই মিউনিসিপালিটীর অন্তঃসীমা পর্য্যন্ত স্থানটী উত্তমোত্তম অট্টালিকা দ্বারা পরিশোভিত।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

(তাঁহার লিখিত ডায়েরী)

১৮৭৩।

৪৩ সাংবৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ।

৮ই মাঘ, সোমবার—সঙ্গত-সভার সাং-বৎসরিক—আমরা নিজে অক্ষম হইলেও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে তাহা সম্পন্ন হইয়া যায় এবং সামান্য পরিশ্রম ও চেষ্টায় কি আশ্চর্য্য ফল ফলিয়াছে দেখিয়া যারপর নাই আশ্চর্য্য হইতে হয়।

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

৯ই মাঘ—ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির সঙ্গে ব্রাহ্মগণের আন্তরিক দুরবস্থা প্রত্যেক ব্রাহ্মের চিন্তার বিষয়। প্রত্যেক ব্রাহ্মের স্বার্থপরতা ও সুখভোগ ত্যাগ করিয়া তজ্জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে।

১০ই মাঘ—ঈশ্বর আছেন সেই সামান্য কথা শুনিয়া অতি পাষণ্ডদিগেরও হৃদয় গলিয়া অশ্রুতে শরীর প্লাবিত হইল। কেন? স্পষ্ট যে দেখিলাম ঈশ্বর আছেন। যেখানে যাই, সেখানে 'আমি আছি।' স্বর্ণাক্ষরে খোদিত। চোর ভূমিতে পড়িয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল, অশ্রুতে পথের ধূলি পরিষ্কার হইয়া, 'আমি আছি'—দেখাইল।

ঈশ্বর হৃদয় গড়িবার সময় স্বর্ণাক্ষরে তাহাতে "আমি আছি" লিখিয়া দিয়াছেন। কেউ না দেখিয়া থাকিতে পারে না।

ব্রহ্ম-পতিত হইয়া কতদূর চলিয়া গেল আবার দেখিয়া ফিরিল। "আমি আছি" ঈশ্বর বলিলেন যথেষ্ট। দুঃখীর দুঃখ, শোকার্ত্তের ক্রন্দন, পাপীর পাপ, মুমূর্ষুর ভয় সকল গেল।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন—দৃশ্য কি মনোহর! উন্মত্ততা আবশ্যক। লোককে বড় আকর্ষণ করে।

রাত্রি—গত বৎসরের ঘটনা সকল জীবনপটে ঈশ্বরের যে করুণা লিখিয়া দিয়া গেল পাঠ করা আবশ্যক।

১১ই মাঘ, বৃহস্পতিবার—আমাদিগের ঈশ্বর সুন্দর, তাঁহার ন্যায় সুন্দর আর কোন দেবতা হইতে পারে না। ঈশ্বরের সত্য, প্রেম, পবিত্রতা—সকল গুণের সমষ্টি তাঁহার সৌন্দর্য্য। মনুষ্যেরা যতদূর পারে, তাহাদিগের দেবতাকে সুন্দর করে, কিন্তু ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য কি মনুষ্য-হস্ত দ্বারা বহির্গত হইতে পারে? মনুষ্য তাঁহার সৌন্দর্য্য বিকৃত ও কলঙ্কিত না করে এই জন্য তিনি প্রত্যেক মনুষ্যকে সৃজন করিবার সময়ে তাহার হৃদয়-পটে আপনার সুন্দর মুখ সুন্দর হস্তে অতি সুন্দর করিয়া আঁকিয়া দিয়াছেন। সে মুখের নিকট আর সকলি কুৎসিত, তাহা দেখিলে আর কি নয়ন ফিরে? ব্রাহ্মগণ! সেই মুখের প্রতি কি দৃষ্টি পড়িয়াছে? একটি বালকের দৃষ্টি মোহিত হইয়া সে দিকে তাকাইয়া থাকিলে তাহার পিতা মাতা সকলে এক এক করিয়া সেইখানে আসিয়া পড়িবে, দেশশুদ্ধ লোক ব্রহ্মের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইবে।

ব্রাহ্মগণ! আজও দেশ-শুদ্ধ লোক কেন ব্রাহ্ম হইল না? তোমাদিগের সকলের দৃষ্টি যে তাঁহাতে আকৃষ্ট হয় নাই। তোমরা শুষ্ক, শুক, কল্পনা-নির্ম্মিত কুৎসিত দেবতার উপসনা কর।

ব্রাহ্মগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যান কেন? তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট আপনাদের ধন, পাণ্ডিত্য, বা সাধুতা কিছু কালের জন্য বন্ধক দেন, আবার সুযোগ পাইলেই আপনাদের বন্ধকী জিনিষ খোলসা করিয়া লইয়া যান। তাঁহাদের বিবেচনায় ঈশ্বরের দাম কম, তাঁদের ধনের দাম বেশী, বেশী দামের জিনিষ না হইলে বন্ধক হইবে কেন? এইরূপ ঈশ্বরের সহিত বাণিজ্য-ব্যবসায় করিয়া অনেকে কিছুদিন আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলেন, পরে নাম কাটান। হে ব্রাহ্ম! তোমার ধনের মূল্য কি এত অধিক, ঈশ্বর-ধনের মূল্য কি এত কম? দুঃখী দীন হীন ব্রাহ্ম ঈশ্বরের নিকট কিছু বন্ধক রাখেন না, তিনি আপনাকে চিরকালের জন্য বিক্রয় করেন। তিনি দেখেন ছিন্ন বস্ত্র, ভগ্ন পাত্র আমার সম্বল, দিবার কিছুই নাই, ইহা দিয়া ত্রিভুবনের অমূল্য রত্ন পাইলাম, আমি এ ধন কখনই ছাড়িতে পারিব না। আমি যাঁর হইলাম, চিরকাল তাঁরই থাকিব। কেননা, তাঁকে অধিকার করিয়া থাকিতে পারিলে অনন্তকাল সুখ

শান্তি লাভ হয়। এই জন্য যে সকল ধনী পণ্ডিত ধার্ম্মিক ব্রাহ্ম অনেক আড়ম্বর লইয়া আসিয়াছিলেন, কেহ ছমাস, ছবছর, দশ বছরে ঈশ্বরের সহিত শোকশোধ করিয়া চলিয়া গেলেন। দুঃখী ব্রাহ্ম যাবজ্জীবন পড়িয়া রহিল, তাহার দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা পাইল। ঈশ্বর অতি সুন্দর—তাঁহার নিকট এই সমাচার শুনিয়া আরও কত ব্যক্তি লোলুপ হইয়া সেই পথে আসিতে লাগিল।

হে ব্রাহ্মগণ! ঈশ্বরকে ছাড়িও না, তিনি কি ধন চিনিলে না। তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখ, আরও সৌন্দর্য্য দেখাইবেন, যে সুখ কোথাও পাইবে না, সেই সুখে চিরকাল সুখী করিবেন। অসার জীবন হইতে সার কথা বহির্গত হয় না, ইহাই সার কথা।

রাত্রি—কি উৎসাহের ব্যাপার, ব্রহ্মবিজয়-নিশান পৃথিবীতে যে প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহার আরও কি দৃঢ় প্রমাণ চাই? দক্ষিণ কাণারা হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কল্পিত কথা নয়, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সত্য। ব্রাহ্মসমাজ পাঁচ জন বালকের নিরর্থক ক্রীড়ার ঘর নয়—ঈশ্বরের হস্ত-স্থাপিত। ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্র অন্যের অপেক্ষা সহস্র গুণে অভ্রান্ত। "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং", "সত্যমেব জয়তে" 'একমেবাদ্বিতীয়ং' চন্দ্র সূর্য্য খসিয়া পড়িলেও এ সকল সত্যের খণ্ডন হইবে না। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকলকে বোধ হয় বলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হইতে পারেন না। প্রাণ যায় যাক, তথাপি ঈশ্বরের মুখ-বিনির্গত কথা বজ্র-ধ্বনিতে ঘোষিত হইবে।

এদেশীয় ১৯ জন দীক্ষিত হন, তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ। আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ প্রভৃতি।

চিত্র-পট।

গান।

ওগো শিল্পী ওগো কবি একি ছবি এঁকেছ?
(আমার প্রাণের বিজন কোণে একি ছবি
এঁকেছ)
মুছে বিশ্বের আলোর চিত্র,
ওগো সখা ওগো মিত্র,
আমার কাল চিত্ত-পটে একি আলো
মেখেছ?
রং ফলিয়ে বিনা বর্ণে,
কান্না হাসির ফুলের পর্ণে
প্রেমের স্বর্ণ-লতার কুঞ্জ সেই ফুলেতে
ঢেকেছ।
জগৎ ভরা নর নারী
আঁকা আছে সারি সারি!
তাদের পায়ের স্নিগ্ধ ছায়ে আমায় এঁকে
রেখেছ।

শিল্পে তোমার কি চাতুরী!
তোমার মুখের শ্রীমাধুরী
ফুটিয়ে ছবির প্রাণের ভাঁজে, পটের মাঝে জেগেছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

শিখগ্রন্থ—সুখমণি সাহিব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ, বাঙ্গালা ভাষার সহিত ইহার বিশেষ পার্থক্য মনে হয় না। পাঠকপাঠিকাগণ অনুবাদের সহিত মূল পাঠ করিলে আনন্দ পাইবেন। ক্রমে শিখ ভাষারও জ্ঞান হইবে।

৮ম শ্লোক।

মন সাচা মুখ সাচা সোয়।
অবর ন পেখৈ একস বিন কোয়।
নানক এই লছন ব্রহ্মজ্ঞানী হোয়॥

যাঁহার মন সত্য, যাঁহার বাক্য সত্য, এবং যিনি এক ব্যতীত অন্য কিছু দেখেন না, নানক বলিতেছেন, এই লক্ষণেই তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া জানিবে॥

অষ্টপদী।

ব্রহ্মজ্ঞানী সদা নিরলেপ।
যৈসে জল নহি কমল অলেপ॥
ব্রহম জ্ঞানী সদা নিরদোষ।
যৈসে সুর সরব কউ সোখ॥
ব্রহম জ্ঞানী কৈ দৃষ্টি সমান।
যৈসে রাজ রংক কউ লাগৈ তুলি পবান॥
ব্রহম জ্ঞানী কৈ ধীরজ এক।
জিউ বসুধা কোউ খোদৈ কোউচংদন লেপ
ব্রহম জ্ঞানী কাই ইহ গুনাউ।
নানক জিউ পাবক কা সহজ শুভাউ॥১

ব্রহ্মজ্ঞানী সদাই নির্লিপ্ত,
যেমন জল মধ্যে কমল নির্লিপ্ত।
ব্রহ্মজ্ঞানী সদাই দোষশূন্য,
যেমন সূর্য্য সকলকেই শুকাইয়া দেয়।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সম দৃষ্টি,
যেমন পবন রাজা এবং দরিদ্র উভয়েতেই বহিয়া থাকে।
ব্রহ্মজ্ঞানীর ধৈর্য্য এক ভাবে থাকে,
যেমন পৃথিবীকে কেহ খনন করে, কেহ কেহ বা চন্দন লেপন করে।
ব্রহ্মজ্ঞানীর এই সকল গুণ স্বভাবসিদ্ধ,
নানক বলিতেছেন, যেমন অগ্নির গুণ স্বাভাবিক॥১

ব্রহম জ্ঞানী নিরমল তে নিরমলা।
যৈসে মৈল ন লাগৈ জলা॥
ব্রহম জ্ঞানী কৈ মন হোয় প্রগাশ।
যৈসে ধর উপর আকাশ॥
ব্রহম জ্ঞানী কৈ মিত্র শত্রু সমান।
ব্রহম জ্ঞানী কৈ নাহি অভিমান॥
ব্রহম জ্ঞানী উচতে উচা।

মন অপনৈ হৈ সভতে নীচা।
ব্রহমজ্ঞানী সে জন ভয়ে।
নানক জিন প্রভু আপ করেয়॥২
ব্রহ্মজ্ঞানী নির্ম্মল হইতেও নির্ম্মল,
যেমন জলেতে ময়লা লাগে না।
ব্রহ্মজ্ঞানীর অন্তর আলোকময়,
যেমন পৃথিবীর উপর আকাশ অবস্থিত।
ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট শত্রু মিত্র সমান।
ব্রহ্মজ্ঞানীর অভিমান নাই।
ব্রহ্মজ্ঞানী উচ্চ হইতেও উচ্চ,
কিন্তু তিনি আপনাকে সকলের নীচে জানেন।
ব্রহ্মজ্ঞানী সেই হইতে পারে,
নানক বলিতেছেন, যাহাকে প্রভু আপনি ব্রহ্মজ্ঞানী করেন॥২
ব্রহমজ্ঞানী সগল কি রীনা।
আতম রস ব্রহমজ্ঞানী চিনা॥
ব্রহমজ্ঞানী কি সভ উপর মযা।
ব্রহমজ্ঞানী তে কছু বুরা ন ভয়া॥
ব্রহমজ্ঞানী সদা সমদরশী।
ব্রহমজ্ঞানী কি দৃষ্টি অমৃত-বরখী॥
ব্রহমজ্ঞানী বন্ধন তে মুকুতা।
ব্রহমজ্ঞানী কি নিরমল যুগতা॥
ব্রহমজ্ঞানী কা ভোজন গিয়ান।
নানক ব্রহমজ্ঞানী কা ব্রহম ধিয়ান॥৩
ব্রহ্মজ্ঞানী সকলের রেণু।
ব্রহ্মজ্ঞানী আত্মার রহস্য চিনিয়াছেন।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সকলের উপর দয়া।
ব্রহ্মজ্ঞানীর দ্বারা কাহারও কিছু অনিষ্ট হয় না।
ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্বদা সমদর্শী।
ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টি অমৃত বর্ষণ করে।
ব্রহ্মজ্ঞানী বন্ধন হইতে মুক্ত।
ব্রহ্মজ্ঞানীর যুক্তি নির্ম্মল।
ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞানই আহার।
নানক বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মই ধ্যান॥৩
ব্রহমজ্ঞানী এক উপর আশ।
ব্রহমজ্ঞানী কা নহি বিনাশ॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ গরিবী সমাহা।
ব্রহমজ্ঞানী পর-উপকার উমাহা॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ নাহী ধন্দা॥
ব্রহমজ্ঞানী লে ধাবত বন্ধা॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ হোয় সুভলা।
ব্রহমজ্ঞানী সুফল ফলা॥
ব্রহমজ্ঞানী সঙ্গ সগল উধার।
নানক ব্রহমজ্ঞানী জপৈ সগল সংসার॥৪
ব্রহ্মজ্ঞানীর আশা একেরই উপর।
ব্রহ্মজ্ঞানীর বিনাশ নাই।
ব্রহ্মজ্ঞানীর বিনয়েতেই আনন্দ।
ব্রহ্মজ্ঞানীর পরোপকারেই সন্তোষ।
ব্রহ্মজ্ঞানীর কোন কর্ম্ম নাই।
ব্রহ্মজ্ঞানী চঞ্চল মনকে বন্ধন করেছেন।
ব্রহ্মজ্ঞানীর শুভ হয়।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সুফল লাভ হয়।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সহিত সকলের উদ্ধার হয়।
নানক বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীকে সকল সংসার পূজা করে॥৪
ব্রহম জ্ঞানী কৈ একৈ রংগ।
ব্রহম জ্ঞানী কৈ বসৈ প্রভ সংগ॥
ব্রহম জ্ঞানী কৈ নাম অধার।
ব্রহম জ্ঞানী কৈ নাম পরবার॥

ব্রহমজ্ঞানী সদা সদ জাগত।
ব্রহমজ্ঞানী অহং-বুদ্ধি তিয়াগত॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ মন পরমানন্দ।
ব্রহমজ্ঞানী কৈ ঘর সদা অনংদ॥
ব্রহম জ্ঞানী সুখ সহজ নিবাস।
নানক ব্রহমজ্ঞানী কা নহী বিনাশ॥৫
ব্রহ্মজ্ঞানীর মনের একই অবস্থা।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সহিত ব্রহ্ম থাকেন।
ব্রহ্মজ্ঞানীর ভগবৎ নামই আধার।
ব্রহ্মজ্ঞানীর ভগবৎ নামই সঙ্গী।
ব্রহ্মজ্ঞানী সতত জাগ্রৎ।
ব্রহ্মজ্ঞানী অহং-বুদ্ধি-হীন।
ব্রহ্মজ্ঞানীর হৃদয়ে পরমানন্দ বিরাজ করে।
ব্রহ্মজ্ঞানীর ঘরে সদাই আনন্দ।
ব্রহ্মজ্ঞানী সুখে ও শান্তিতে বাস করে।
নানক বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীর বিনাশ নাই॥৫

ব্রহমজ্ঞানী ব্রহমকা বেতা।
ব্রহমজ্ঞানী এক সংগ হেতা॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ হোয় অচিংত।
ব্রহমজ্ঞানীকা নিরমল মংত॥
ব্রহমজ্ঞানী যিস করৈ প্রভ আপ।
ব্রহমজ্ঞানী কা বড় পরতাপ॥
ব্রহমজ্ঞানী কা দরশ বড়ভাগী পাইয়ে।
ব্রহমজ্ঞানী কউ বল বল যাইয়ে॥
ব্রহমজ্ঞানী কউ খোজহি মহেশুর।
নানক ব্রহমজ্ঞানী আপ পরমেশুর॥৬
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মবিৎ হয়েন।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সেই একের সঙ্গে প্রেম।
ব্রহ্মজ্ঞানীর চিন্তা নাই।
ব্রহ্মজ্ঞানীর মত নির্ম্মল।
যাঁহাকে প্রভু ব্রহ্মজ্ঞানী করেন, সেই ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারে।
ব্রহ্মজ্ঞানীর অত্যন্ত প্রতাপ।
সৌভাগ্যশালীরাই ব্রহ্মজ্ঞানীর দর্শন পায়।
ব্রহ্মজ্ঞানীকে বলিহারি যাই।
ব্রহ্মজ্ঞানীর অনুসন্ধান মহেশ্বর করেন।
নানক বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীই স্বয়ং পরমেশ্বর॥৬

ব্রহমজ্ঞানী কি কিমত নাহি।
ব্রহমজ্ঞানী কৈ সগল মনমাহি॥
ব্রহমজ্ঞানী কা কউন জানৈ ভেদ।
ব্রহমজ্ঞানী কউ সদা আদেশ॥
ব্রহমগিয়ানী কা কথিয়া ন যায় অধাখর।
ব্রহমগিয়ানী সরব কা ঠাকুর॥
ব্রহমগিয়ানী কি মতি কউন বখানৈ।
ব্রহমগিয়ানী কি গতি ব্রহমগিয়ানী জানৈ॥
ব্রহমগিয়ানী কা অন্ত ন পার।
নানক ব্রহমগিয়ানী কউ সদা নমস্কার॥৭
ব্রহ্মজ্ঞানীর মূল্য নির্দ্দেশ হয় না।
ব্রহ্মজ্ঞানীর মনোমধ্যে সকল বস্তু।
ব্রহ্মজ্ঞানীর বিষয় কে জানিতে পারে?
ব্রহ্মজ্ঞানীকে সর্ব্বদা নমস্কার করি।
ব্রহ্মজ্ঞানীর অর্দ্ধ অক্ষরও বর্ণনা করা যায় না।
ব্রহ্মজ্ঞানী সকলের ঈশ্বর।
ব্রহ্মজ্ঞানীর বিষয় কে বলিতে পারে?
ব্রহ্মজ্ঞানীর বিষয় ব্রহ্মজ্ঞানীই জানেন।
ব্রহ্মজ্ঞানীর অন্ত বা পার নাই।
নানক ব্রহ্মজ্ঞানীকে সদা নমস্কার করিতেছেন॥৭

ব্রহমজ্ঞানী সভ সৃষ্টিকা করতা।

ব্রহমজ্ঞানী সদ জীব নহি মরতা॥
ব্রহমজ্ঞানী মুকত যুগত জীয়কা দাতা।
ব্রহমজ্ঞানী পূরণ পুরুষ বিধাতা॥
ব্রহমজ্ঞানী অনাথ কা নাথ।
ব্রহমগিয়ানী কা সভ উপর হাথ॥
ব্রহমগিয়ানী কা সগল অকার।
ব্রহমগিয়ানী আপ নিরংকার॥
ব্রহমজ্ঞানী কি শোভা ব্রহমজ্ঞানী বনী।
নানক ব্রহমজ্ঞানী সবর কা ধনী॥৮
ব্রহ্মজ্ঞানী সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা।
ব্রহ্মজ্ঞানী সদা জীবিত, মৃত হয়েন না।
ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষের মুক্তি ও বিবেকের দাতা।
ব্রহ্মজ্ঞানী পূর্ণ-পুরুষ বিধাতা।
ব্রহ্মজ্ঞানী অনাথের আশ্রয়।
ব্রহ্মজ্ঞানীর হস্ত সকলের উপর প্রসারিত।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সকল সৃষ্ট-বস্তুর উপর অধিকার।
ব্রহ্মজ্ঞানীই স্বয়ং নিরহঙ্কার পুরুষ।
ব্রহ্মজ্ঞানীর শোভা ব্রহ্মজ্ঞানীতেই সাজে।
নানক বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানী সকল ধনে ধনী॥৮

(ক্রমশঃ)

বর্ষশেষ।

সে আসিয়াছিল, আবার চলিয়া গেল। নিরূপিত সময়ে সে চলিয়া গেল। আমাদের পৃথিবী তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল। কত যত্নে, কত মমতায় গ্রীষ্ম তাহাকে উত্তাপ দিয়াছিল, বর্ষা তাহাকে স্নান করাইয়াছিল, শরৎ তাহাকে কৌমুদী-স্রোতে ভাসাইয়াছিল, হেমন্ত তাহাকে শৈত্য মাখাইয়াছিল, শীত তাহাকে জড়-সড় করিয়াছিল, বসন্ত তাহাকে শ্যামলোচ্ছ্বাসে, মধুর বাতাসে পূজা করিয়াছিল। ফল-ফুলে তরুলতা তাহাকে প্রীতি-উপহার দিয়াছিল, বিহঙ্গকুল তাহাকে গান শুনাইয়াছিল, মানব বার মাসে "তের পার্ব্বণ" করিয়া তাহার সংবর্দ্ধনা করিয়াছিল। যাহার যাহা ছিল, তাহার প্রীত্যর্থে তাহা সকলেই দিয়াছিল, কিন্তু তবু সে থাকিল না। সকল আদর ও যত্ন অবহেলা করিয়া, সকল আত্মীয়তা উপেক্ষা করিয়া, সে কর্ত্তব্য-পরায়ণ নিষ্ঠুর—তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইলেই চলিয়া গেল! এত আয়োজনে মমতা-ডোরে কেহ তাহাকে বাঁধিতে পারিল না! সে সত্য সত্যই চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেল। এ জগতে যাহারা আসে, তাহারা এমনি করিয়া চলিয়া যায়। এই চন্দ্র সূর্য্য, নক্ষত্রালোকময় নীলাকাশ, এই ফল-ফুল-সুশোভিত তরু-লতা, এই বিহঙ্গ-কূজিত শ্যামল বনরাজী, স্বচ্ছ-সলিল-পূর্ণ নদ-নদী ও সরোবর, এই বৈচিত্র-

ময় ছয় ঋতু, এই উত্তাল-তরঙ্গ-পূর্ণ বিশাল সমুদ্র, উন্নত-শীর্ষ মহাকায় পর্ব্বত শ্রেণী, এই মানবের ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, এই আশা-ভরসা-পৌরুষ, এই সম্মান গৌরব-যশঃ, এই বিদ্যা বুদ্ধি সম্পদ এই জগতের শত সহস্র প্রকার বন্ধন—মানব দানবীর হরিশচন্দ্রই হউক, কর্ম্মবীর রামচন্দ্রই হউক, তেজস্বী কর্ণই হউক, যশস্বী অর্জ্জুনই হউক, সে দয়াশীলতায় শাক্যসিংহই হউক, নিষ্ঠুরতায় তৈমুরলঙ্গই হউক, সে আত্মত্যাগে যীশুখ্রীষ্টই হউক, স্বার্থপরতায় আরঙ্গজেবই হউক, সে ঐশ্বর্য্য-শালিতায় গজনীর মামুদই হউক দারিদ্র্যে রঘু ভিখারীই হউক, মানব যাহাই কেন হউক না, নিরূপিত সময়ে এই পুরাতন বর্ষের মত সকল ছাড়িয়া তাহাকে যাইতেই হইবে। অতৃপ্ত কামনা ভোগ করিবার জন্য সে অতিরিক্ত একদিনও থাকিতে পারিবে না। কিন্তু সে যে সকল প্রিয়তর, প্রিয়তম ভোগ্য ফেলিয়া চলিয়া যাইবে—সেই অজ্ঞাত দেশে যাইবার পাথেয় সে সংগ্রহ করিতে পারে কই? আমরা সকলেই ত শুনিয়াছি, সে পাথেয়—ধর্ম্ম। হায়, তবে আমরা কেন বুঝিলাম না?—কয় দিনের জন্য আসিয়া কেন এমন করিয়া মজিলাম? কেন আপাত সুখের প্রলোভনে ধর্ম্মবুদ্ধিকে বিকাশ পাইতে দিলাম না?—কেন অধর্ম্মাচরণ করিলাম?

লোকে বলিয়া থাকে,

—"ত্বয়া হৃষীকেশ!—
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"

কিন্তু আমার সেই গুরু, সত্যস্বরূপ, নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক দেবতা কখনও কি আমাকে অধর্ম্মাচরণে নিযুক্ত করিতে পারেন? তিনি যে আমাদিগকে অধর্ম্ম-পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য কত উপায় বিধান করিয়াছেন। ধর্ম্মভাব ও সাধুতার প্রতি আমাদের স্বাভাবিক অনুরাগ, আমাদের আত্মসংযম, আমাদের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, আমাদের ত্যাগ-স্বীকার-জনিত আত্মপ্রসাদ—এ সব কিসের জন্য দিয়াছিলেন? আমরা ধর্ম্ম-পথে থাকিব, শেষের দিনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইব বলিয়া। কিন্তু হায়, মূর্খ মানব, অপরিণামদর্শী মানব, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কারাদি রিপুগণের উত্তেজনায় সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলিয়া যায়! মানব-জীবন কেবল দুঃখের বোঝা, অশান্তির বোঝা করিয়া ফেলে। কি দারুণ ভ্রান্তি!

যাহা হউক, বলিতেছিলাম, আমাদের সে পরিচিত বর্ষ চলিয়া গেল। তাহাকে কোনরূপেই আমরা রাখিতে পারিলাম না।—কাহাকেও আমরা রাখিতে পারি নাই। আমাদের কালিদাস, ভবভূতি গেলেন, আমাদের রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গেলেন, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র গেলেন, আমাদের রাখালদাস ন্যায়রত্ন গেলেন, গোপালকৃষ্ণ গোখেলেও গেলেন, মহারাণী স্বর্ণময়ী ও শরৎ সুন্দরী গেলেন,

দেবী ভগবতী ও সারদা সুন্দরী গেলেন, আনন্দ বাই যোশী গেলেন, দেবী জগত্তারিণীও গেলেন, আমরা কাহাকেও রাখিতে পারিলাম না! তবু আমাদের কত স্পর্দ্ধা! শক্তি-প্রয়োগের কতই গর্ব্ব! আমাদের মত অর্ব্বাচীন আর কোনও জগতে বর্ত্তমান আছে কি?

তবে তুমি যাও। আমাদের পরিচিত প্রিয় পুরাতন বর্ষ! তবে তুমি যাও। আমাদের বর্ষব্যাপী ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, পাপ-পুণ্যের স্মৃতি লইয়া, আমাদের বর্ষব্যাপী রোগ-আরোগ্য, সুখ-দুঃখ, আশা-দুরাশা, উদ্যম জড়তা, উন্নতি অবনতির চিহ্ন বহিয়া, আমাদের সংবৎসরের পরমায়ু গ্রহণ করিয়া তুমি চিরদিনের জন্য কাল-স্রোতে ভাসিয়া যাও। আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, তুমি আমাদের জীবনে যে সকল অভাব দেখিয়া গেলে আগামী বর্ষে তাহা পূর্ণ হউক, তুমি যাহা অবনতি বুঝিয়া গেলে ভগবৎকৃপায় তাহাই আগামী বর্ষে উন্নতির সোপান হউক।

লেখিকা—শ্রীমা—

শিল্প-শিক্ষা।

আজকাল সকলেই শিল্প-শিক্ষার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক। বর্ত্তমান সময়ে নানারূপ শিল্পেরও প্রচলন হইতেছে বটে, কিন্তু এক্ষণে আমাদের দেশে সূচী-শিল্পেরই অধিক প্রয়োজন। গৃহসজ্জা, পুত্রকন্যাগণের বাটীতে পরিবার উপযোগী পরিচ্ছদ প্রভৃতি এখন প্রায় সকলেই নিজের হস্তে প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক এবং অনেকে তাহাই করেন। আধুনিক সভ্যতার গুণে গৃহের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য রমণীগণ নানারূপ শিল্প শিক্ষা করিয়া গৃহাদি সজ্জিত করিতেছেন। এক দিকে যেমন গৃহের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, অপর দিকে নিজ নিজ শিশু-সন্তানদিগকে সভ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্যও চেষ্টা হইতেছে। ইহাতে বঙ্গগৃহের গৃহলক্ষ্মীগণের অনেক বিষয়ে উন্নতি সাধন হইতেছে। এখন আর বৃথা গল্প ও তাসখেলা কিম্বা দিবা-নিদ্রায় তাঁহারা সময়ের অপব্যয় করিতে পারেন না।

গৃহ ও সন্তানগণের পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে যাঁহারা উদাসীন, তাঁহারাও অন্যের গৃহের সৌন্দর্য্য ও সন্তানগণের পরিষ্কার পরি-চ্ছন্নতা দর্শন করিয়া নিজেদের গৃহ ও সন্তানগণকে ঐ প্রকারে রাখিতে সচেষ্ট হইবেন। তাঁহাদের মনের অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে, এবং ইহাতে গৃহের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য উভয়ই বৃদ্ধি ও দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে। শিশু-

দিগের বেনিয়ান্‌, ফ্রক, পাজামা ও নিজেদের সেমিজ, ক্রুশের কাজ প্রভৃতি আজকাল প্রায় সকলেই প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু জ্যাকেট প্রভৃতি কাটিতে প্রায় অনেকেই পারেন না, এজন্য অনেকেই ইহা শিখিতে ইচ্ছা করেন। আজ একটী জ্যাকেট কাটিয়া শিক্ষাভিলাষিণী পাঠিকাগণের সুবিধার জন্য ইহার সহিত দেওয়া হইল, ইহাতে কিরূপে জ্যাকেট কাটিতে হয় তাহার একটি নমুনা পাইবেন।

জ্যাকেটের প্রথমে দুইটা সম্মুখ দিকের বুক কাটিতে হয়, পরে পিঠ ও তাহার পর পার্শ্বের দিক কাটিয়া লইলেই বডি হইল। হাত নিজেদের রুচি মত কাটিতে পারেন, ইহার কোনও গোল নাই, শুধু (Armhole) অর্থাৎ বগলের দিক একটু কাটিয়া লইতে হয়।

এখন ইহার মাপ কিরূপে লইতে হয় তাহা জানা আবশ্যক। একটী গজের ফিতা লইয়া যে গায়ের জ্যাকেট হইবে তাহার মাপ লইতে হইবে। প্রথমতঃ বুকের (ছাতির) চওড়া, (নমুনার ৪ চিহ্নিত স্থান হইতে সম্মুখের বুকের শেষ পর্য্যন্ত চওড়া), তৎপরে বগলের নীচে হইতে বুকের সম্মুখ পর্য্যন্ত চওড়া, পরে পিঠের চওড়া (পিঠের কাটের নমুনার ৪ চিহ্নিত স্থান হইতে সমস্ত চওড়াটা), পরে কোমরের বেড়, বুকের ২ চিহ্নিত স্থান হইতে সম্মুখের চওড়া, পিঠের ১ চিহ্নিত স্থান হইতে চওড়া, গলা ও লম্বা ঝুল যেখানে যত মাপ হইবে সেই মাপ অনুসারে কাটিলেই একটী ঠিক গায়ের মতন জ্যাকেট হইবে। ইহার সঙ্গে যে নমুনাটী দেওয়া হইল তাহা অর্দ্ধেক, (এক দিকের বুক, এক দিকের পিঠ, এক দিকের পার্শ্বের)। এইরূপ বুক পিঠ ও পার্শ্বের কাপড় ডবল করিয়া লইয়া কাটিলেই একেবারে একটী পুরা জামা কাটা হইয়া যাইবে।

যাঁহাদের গজের ফিতা দিয়া মাপিয়া করা কঠিন বোধ হইবে, তাঁহারা এই কাটটীকে কাপড়ের উপর ফেলিয়া অনায়াসে কাটিতে পারেন। যে জ্যাকেট এই মাপ হইতে ছোট হইবে তাহা ইহা হইতে একটু ছোট করিয়া, আর যেটা বড় হইবে তাহার কাপড় এই মাপ হইতে বড় করিয়া রাখিয়া কাটিলেই হইতে পারে।

জ্যাকেট সেলাই করিবার নিয়ম—প্রথম বুকের পার্শ্বের কাটের যে দিকটা ছোট (২ চিহ্নিত), সেই দিকের সঙ্গে পার্শ্বের কাটের টুকরার (২ চিহ্নিত) ছোট মুখের সঙ্গে জোড়া দিতে হইবে, পরে পিঠের কাটের যে দিকটা কোর করিয়া কাটা (১ চিহ্নিত) সেই দিকের সহিত পার্শ্বের কাটের যে দিকটা বেশী লম্বা (১ চিহ্নিত) সেই দিকের সহিত জোড়া দিতে হইবে, তৎপরে ৩ চিহ্নিত বুকের কাঁধের সহিত ৩ চিহ্নিত পিঠের কাঁধের কাটের জোড় হইবে। এইরূপে দুইটী বুক ও পিঠ দুইটী পার্শ্বের কাটের সহিত

জোড়া দিয়া দুইটী পিঠের মাঝে (দুই দিককার পিটের টুকরা) সেলাই করিয়া কাঁধ দুইটী সেলাই করিয়া পরে ৪ চিহ্নিত হাতের গর্ত্তের (Armhole) সঙ্গে হাত সেলাই করিলেই একটী সম্পূর্ণ জ্যাকেট তৈয়ারী হইল।

হাতের মাপও ঐরূপেই লইতে হইবে। আজ যে কাটটী দেওয়া হইল ইহাতে যদি শিক্ষার্থিনীগণের শিখিবার সুবিধা হয়, তাহা হইলে পরে অন্যান্য কাট দিবার ইচ্ছা রহিল।

৺ সুকান্তি-লিখিত দৈনিক লিপি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

২৯শে পৌষ, সোমবার।

পরম করুণাময় পিতা! তুমি যে অসীম করুণার আধার তাহা বেশ বুঝিলাম। নতুবা এত পাপ করিয়াও কেন তোমার করুণা হ'তে বঞ্চিত হই নাই। তুমি যে পতিতের উদ্ধারকর্ত্তা তা'তে আর সন্দেহ কি? হৃদয়ে যে নূতন আশা দিলে, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার করুণায় যেন তাহা অপূর্ণ থাকে না। তোমার নামে যে অসীম শক্তি নিহিত আছে, তাহা যেন সর্ব্বদা প্রাণে ধ্বনিত হইতে থাকে। প্রভো! হৃদয়ে বল দাও যেন দুর্ব্বলতাকে জয় করিতে পারি। আমি ত মানুষ, মানুষ করে যখন সৃজন করেছ, তখন মানুষের সবই ত আমাতে আছে। তবে আমি নিরাশার পশ্চাৎপদ হই কেন? প্রভো! প্রাণে সুমতি জাগিয়ে দাও। আবার নূতন উদ্যমে যেন তোমাকে স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি। তোমাকে যেন কখনই ভুলি না। তোমার অসীম ক্ষমতা যেন প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

২৮শে চৈত্র। ১০ই এপ্রিল।

দয়াময়, আজ শরীর মন বড় দুর্ব্বল। প্রাণে তোমার শক্তি আর অনুভব করি না, স্ফূর্ত্তি পাই না, হৃদয় যেন অলসতায় ডুবিয়াছে। মনে হয় তুমি পাপী বলে আমাকে তোমার করুণা হ'তে বঞ্চিত করলে। মন যেন নিরাশার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। জীবনে আর কোন কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিব, সুপথে চালিত হইব, বলিয়া মনে হয় না। দয়াময়! এ পরিবর্ত্তনের মাঝে কোন্ পাপশক্তি কার্য্য করিতেছে বুঝি না। তোমার করুণা-হারা হয়ে এখন যে সংসার সাগরে কেঁদে মরছি। যখন ভারি দরিদ্রতার কথা—যখন তোমার শক্তি ভুলে নিজের

ক্ষুদ্র শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়া লাঞ্ছিত হই, তখন সংসারের প্রতি আর শ্রদ্ধা থাকে না। ঐ যে রাস্তায়—অসংখ্য মানব যাতায়াত করিতেছে, তাহার মধ্যে কয়জন প্রকৃত সুখী? সকলেই সংসারের গঞ্জনায়, প্রলোভনে, অত্যাচারে, অবিচারে অশান্তিতে জর্জ্জরিত। দয়াময়! তবে কি সংসারকে এমনি শ্মশানতুল্য করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছ। আজ যাহাকে সুপথে চলিতে দেখিতেছি, তোমার শক্তি-বলে যাহাকে নূতনভাবে ও আশা দ্বারা অনুপ্রাণিত দেখিতেছি, সংসারের সামান্য দুর্ঘটনায় আবার তাহাকে উৎকণ্ঠিত, জ্ঞানহীনের ন্যায় উন্মত্ত অবস্থায় দেখি কেন প্রভু? তোমাকে বুঝিয়া আবার তোমাকে হারান যে বড়ই কষ্টের কথা, বড়ই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। দয়াময়! এ সব দেখিয়া মনে হয় তুমি নাই। সংসার কখন সুখের স্থান নয়। অমনি জীবনের সমস্ত লক্ষ্য ভুলে যাই। নৈরাশ্য আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু আবার তোমার কি অদ্ভুত কৌশল যে, অধিকক্ষণ এ ভাব থাকে না। তুমি যেন আবার হৃদয়ে গর্জ্জন করিয়া ভীম স্বরে বলে দাও—সংসার সুখের স্থান, দুঃখের নহে—আমরা অবিবেক, তাই কষ্ট পাই। কুপথে চালিত হয়ে শেষে নৈরাশ্যের কঠোর আঘাতে আত্মঘাতী হতে চেষ্টা করি। কিন্তু তোমার এ উপদেশবাক্য ত হৃদয়ে তখন তেমন কাজ করে না। তখনও সন্দেহ হয়, তুমি আছ কি না? তুমি যদি থাকবে, তবে এত কষ্ট পাই কেন? তোমায় ত কত ডাক্‌ছি, তুমি সাড়া দাও কই, জীবনে উদ্দীপনা এনে দাও কই? আশায় উদ্দীপিত কর কই? আর যদি এত কষ্ট দিবে, তবে তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা দাও না কেন প্রভু? সংসারকে নূতন করে গড়ে তুলে নিতে শক্তি দাও না কেন? তোমার শক্তি অনন্ত, অসীম, ক্ষুদ্র মানবের বুদ্ধির অগোচর, তবে তোমার সাহায্য ভিন্ন কেমন করে এ দুস্তর সাগর পার হইব প্রভু? তুমি বলে দাও কেমন করে ভেলা তৈয়ার করে পার হ'তে পারব। যেমন কষ্টের ভিতর রাখিয়াছ তেমনি প্রাণে তাহা বহন করিবার শক্তি দাও, নূতন আশা উদ্যম দ্বারা সহায়তা কর। তুমি পতিতের একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা, দীনের সম্বল। তুমি বলে দাও প্রভু! কোন্ পথে গেলে শান্তি পাব, সংসারের ভিতর স্বর্গের বিমল আনন্দ পাইয়া সুখী হইব। সংসারের ভিতর তোমার সুন্দর ছবি লোকে কল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু আমি অধম তাই তোমায় দেখিতে পাই না।

মাতার স্নেহ-অনুরাগ যে তোমার প্রীতি-ছবি তাহা কেন জীবনে অনুভব করি না। দয়াময়! আমি যে ঘোর পাতকী, তাই বুঝি তুমি আমাকে সে জ্ঞানামৃত হইতে বঞ্চিত করেছ। তাই বুঝি আমায় শিক্ষা দিবার জন্য আত্মীয় স্বজনের স্নেহ করুণা হ'তে বঞ্চিত করেছ। দয়াময়! তুমি এবে দয়া না করলে ত আর প্রাণে

শান্তি পাই না। তুমি অবোধ সন্তান বলে ক্ষমা না করলে আমার কি গতি হবে প্রভু! তুমি দয়ার সাগর, পাপীর উদ্ধার-কর্ত্তা, জীবনের লক্ষ্যস্থল, তুমি টেনে তুলে লও। এ ঘোর পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার কর প্রভু! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

১লা বৈশাখ ১৩২০ সাল, সোমবার।

পরম পিতা জগদীশ! তোমার করুণায় আজ আমরা নূতন বর্ষে পদার্পণ করিলাম। অতীতের, গত বর্ষের, কথা মনে হইলে প্রাণে দুঃখ হয় যে, জীবনকে লক্ষ্যের দিকে এক পদও চালাইতে পারি নাই। দিন দিন করিয়া কত বৎসর কাটিল, কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিলাম না বা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম না। আজ নব বর্ষে মনে আবার কত আশা ও চিন্তা উদিত হইতেছে! জীবনকে এবার হইতে আর তোমার নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত হতে দিব না। তোমার কর্ত্তৃত্বে থাকিয়া সত্যের পথে, কর্ত্তব্যের পথে চলিব। তুমি নূতন বর্ষে আমাদিগকে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত কর। প্রাণে সুপথে চলিবার জন্য একটা নূতন উদ্দীপনা প্রেরণ কর। তোমাকে বুঝিতে পারিলে, তোমার শক্তিতে আমরা কত অসাধ্য সাধন করিতে পারিব, বাঙ্গালী পরিবারের নিত্য হাহাকার রব, অশান্তি, অনুৎসাহ দূর করিয়া তাহাকে তোমার প্রেমের নিকেতনে পরিণত করিতে পারিব। দয়াময়, যখন নির্জ্জনে তোমার আরাধনায় বসি, যখন বিশ্বের অনন্ত ছবি মনে হয়, তখন স্বতঃই তোমাকে পাইবার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে অনুভব করি। তখন ত কোন উপদেষ্টা সঙ্গে যাইয়া তোমার কথা বলিয়া দেন না, প্রকৃতিই যেন তোমার দিকে মনকে টানিয়া লয়। যতক্ষণ তোমার চিন্তায় কাটাই, যতক্ষণ তোমার অপার মহিমা অনন্ত শক্তির কথা ভাবিতে থাকি, ততক্ষণ সংসারের কোলাহল হৃদয়ে থাকে না, প্রাণে এক অভাবনীয় আনন্দ শান্তি পাই। তুমি অনন্ত তোমাকে যত ভাবি, ততই যেন তোমা হইতে দূরে যাই, কিন্তু তবু তোমার চিন্তা হ'তে মনকে যেন আর নিবৃত্ত করিতে ইচ্ছা হয় না। এ কি অমৃত, কি মধুর ভাব যে, যত তোমায় ভাবি ততই তাহাতে আকাঙ্ক্ষা বাড়ে।

তোমায় আস্বাদন করিতে পারিলে, প্রভু! জীবন তোমাতেই ডুবে থাকতে চায়। দয়াময়, তুমি আজ ভাল করে আমায় বল কোন পথে চলিলে তোমায় বুঝতে পারব। জীবনকে তোমার আদেশানুযায়ী পরিচালিত করে সুখী হইব। নির্জ্জনে তোমার চিন্তায় বসিলে তোমার সত্তা প্রাণে যেমন অনুভব করি, সংসারের ভিতর থাকিয়া তোমার মহিমা তেমন উপলব্ধি করিতে পারি না কেন? সংসারে অশান্তি পাই বলিয়াই ত তোমাকে ধীরভাবে ভাবিতে পারি না। সংসারের দুঃখ দুর্ঘটনায় মনকে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। কিন্তু সে তোমারই দান। তুমি সেই দুঃখ, বিপদ

কেবল আমাদিগকে তোমার দিকে লইয়া যাইবার জন্যই প্রেরণ করে। সংসারের কোলাহল, অশান্তি সর্ব্বদা বলে দেয় যে, তুমিই শান্তির একমাত্র আস্পদ। সংসারে আমি সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারি যদি তাহাতে তোমার করুণা ও শক্তি অনুভব করি। তোমার কথা ভুলে গিয়ে সংসারকে নিজের ইচ্ছামত চালাইতে চাই, তাইত অশান্তি ভোগ করি ও মনে করি সংসারের কোলাহল হইতে দূরে না গেলে তোমাকে বুঝিতে পারিব না। কিন্তু এ শিক্ষা আবার মুহূর্ত্ত পরেই ভুলে যাই কেন? তুমি এ শিক্ষা হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দাও। জননীর নিঃস্বার্থ ভালবাসায়, ভ্রাতা ও ভগিনীরমধুময় স্নেহে, পত্নীর পবিত্র প্রেমে যেন তোমার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। তুমি সংসারে পাঠাইয়াছ—সংসার ত্যাগ করিবার জন্য নহে। সংগ্রামে পরাজিত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিলে তোমার আদেশ পালন করা হইল না। সংসারে থাকিয়া তোমার নামরূপ অসি লইয়া, সমস্ত কুভাবকে দমন করিতে হইবে,তবেই ত তোমায় বুঝিতে পারিব ও তোমার শক্তির মহিমা উপলব্ধি করিয়া স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইব। জীবনের চরম লক্ষ্য তোমায় লাভ করা,তোমার আদেশ পালন ও তোমার শক্তি অনুভব করিয়া কর্ত্তব্যের দিকে অগ্রসর হওয়া। ধর্ম্ম বলিলে আমরা ইহাই বুঝি যে, যাহাতে সত্যকে বুঝিতে পারা যায় ও তোমার সত্তা উপলব্ধি করিয়া জীবনে প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভ করা যায়, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম।

তাই প্রভো, তুমি সংসারে সুখ ও দুঃখ রাখিয়াছ। যে তোমায় ভুলে, কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হয়, তাহাকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আর যে জীবনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, নীতির পথানুসরণ করে, দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত তোমার উপর নির্ভর করে, সে মানবজীবনের সুখ ও শান্তি ভোগ করিয়া ধন্য হয়। দাও পিতা, সেই পথ দেখাইয়া দাও, যে দিকে জীবনকে চালিত ক'রে স্বর্গের ন্যায় বিমল আনন্দ পাইব। এখন থেকে নীতি কি তাহা বুঝিতে দাও ও প্রাণে তাহার অনুসরণ করিবার উপযুক্ত বল ও আশার সঞ্চার ক'রে দাও। উচ্ছৃঙ্খল মানব কখনও জীবনে উন্নতি করিতে পারে না। কখনও সুখলাভে সমর্থ হয় না। যে কাজ জীবনকে উন্নতির দিকে অগ্রসর না করে, সে কাজ দুষ্কর্ম বলিয়া গণ্য, যাহাতে প্রাণে শান্তি আরাম না পাই, যাহার জন্য পরে অনুতাপ করিতে হইবে এমন কাজ যেন না করি। দয়াময়! তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন কখনও সংসারের প্রলোভনে ভুলি না। সংসারে তুমি ভাল মন্দ দুইই প্রেরণ করিয়াছ, প্রত্যেকের জীবনে এ সংগ্রাম দিবানিশি চলিতেছে। প্রভু, আমার মন যে বড় দুর্ব্বল, বিবেক যে শক্তিহীন, তুমি সব বলে বলীয়ান্ কর যেন এ সব প্রলোভন হ'তে মনকে দূরে রাখিতে পারি। দয়াময়! তুমিইত পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা, সমস্ত জগৎ

জুড়িয়াও তোমার স্থায় পাপীর বন্ধু মিলিবে না। তুমি নিজে এসে পাপীকে তোমার করুণা দ্বারা সুপথে টানিয়া লও। তোমাতেই তাহার বল, তুমি তাহার নিকট শক্তির উৎস। তোমার চিন্তায় দুর্ব্বল প্রাণে যে বল আসে, তোমার চিন্তায় প্রাণে পুনঃ যে আশার সঞ্চার হয়, তাহার তুলনা নাই। তাই প্রভো! তোমায় পাইতে ইচ্ছা হয়। এমন দয়াল যিনি, পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা যিনি, দুর্ব্বলের সহায় যিনি, সেই চির আকাঙ্ক্ষিত ধন তোমাকে জানিতে ইচ্ছা হয়। দয়াময়! তুমি নব বর্ষের দিনে প্রাণের মলিনতা দূর কর ও নব উৎসাহের বহ্নি প্রজ্বলিত কর, নৈরাশ্যে যেন হৃদয়কে নিস্তেজ করি না। তোমার স্বরূপ চিন্তনে যেন হৃদয়ে শক্তি অনুভব করিয়া কর্ত্তব্যের দিকে অগ্রসর হই। এই কর, প্রভু! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

কালষষ্ঠী।

(পুত্র-শোকাকুল পিতার কাতরোক্তি)।

(১)

বাসন্তী পঞ্চমী কালি গিয়াছে চলিয়া,—
বঙ্গবাসী ঘরে ঘরে বাণীর চরণ
পূজিয়াছে ভক্তিভাবে আনন্দে মাতিয়া,
দুখের বারতা কা'র ছিল না তখন।

(২)

কিবা ছোট কিবা বড় ছিল না বিচার,
নতশিরে বাণী-পদে প্রণিপাত করি,
মাগিয়াছে বিদ্যারত্ন সুখের ভাণ্ডার,
চারি দিকে ছুটিয়াছে উৎসাহ লহরি।

(৩)

চূতপত্র, ফুলমালা, রম্ভাতরু দ্বারে,
সিন্দূরের কৌটা গায় নারিকেল ফল
পূর্ণকুম্ভমুখে ওই পূজার আগারে,
দেবী-আগমন বার্ত্তা বুঝিছে কেবল।

(৪)

বাগ্‌দেবী বীণাপাণি ভারতী-মাতার
বিদ্যালয়ে ভক্তবৃন্দে স্তুতি গান করে,
সুকুমার ছাত্রদলে আনন্দ অপার,—
দেবী-আরাধনা করে বিদ্যালাভ তরে।

(৫)

পঞ্চমীর অবসানে দিল দরশন
কাল-ষষ্ঠী বঙ্গে আজ কাঁদাতে সবার,—
সরস্বতী জননীর হ'ল নিরঞ্জন,
সেই সঙ্গে পুত্র মম গেল রে কোথায়!

(৬)

প্রাণের সেবেন মম স্নেহের আধার,
বাণী-সনে ঝাঁপ দিলে কাল-সিন্ধু-জলে!
কোথা বাছা গেলে চলে—কি দোষ আমার,
তব জননীরে আমি বুঝাব কি বলে!

(৭)

চলে গেল ভারতী—সে আসিবে আবার,
তুই কি ফিরিয়া বাছা আসিবিরে ঘরে?
তব তরে খোলা ওই স্বর্গের দুয়ার,
যাও বাছা চলে যাও হরির অন্তরে।

(৮)

পর পারে যা'ব যবে হইবে মিলন,
আশায় বাঁধিয়া বুক রহিনু দুজনে,—
আবার আসিলে ষষ্ঠী হইবে স্মরণ,
তোর ওই প্রেম-মাখা পবিত্র আননে।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল।

গত ২০শে মার্চ্চ শনিবার মেরি কার্পেণ্টার হলে ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের চতুর্থ সাম্বৎসরিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। চন্দন-নগরের শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের পত্নী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রায় ২০০ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের অন্তঃপুর-শিক্ষা-কার্য্যে দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই সহানুভূতি ও উৎসাহ আছে। যে সকল ছাত্রী গত ডিসেম্বর মাসের পরীক্ষায় খুব সফলতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক জনকে স্বর্ণপদক ও দুই জনকে রৌপ্যপদক দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রীদের মধ্যে দুইজন বাঙ্গালা আবৃত্তি ও একজন ইংরাজী আবৃত্তি করে। তাহারা ২।৩টী জাতীয় সঙ্গীতও অতি সুন্দররূপে গাইয়া দর্শকদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। সিক্রেটারী গত বৎসরের যে রিপোর্ট পাঠ করেন, তাহাতে দেখা যায় যে,গত বৎসরে সমিতির কিছু লোকসান সত্ত্বেও ইহার আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল। গত বৎসরের প্রথমেই সমিতি ১৯১৩ সালের ১৩০০৲ টাকার মধ্যে ৮০০৲ পরিশোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং আয়-ব্যয়ের সামাঞ্জস্য রাখিতে পারিয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে যাহাতে শিক্ষয়িত্রী-ভবনের পত্তন হয়, সমিতি এখন প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতেছেন।

বামারচনা।

মর্ম্মগাথা। *

১

আজি, বল মোরে বল—
সোণার প্রতিমা কেন ফেলে অশ্রুজল?
যে মুখ হেরিলে পরে
শত দুঃখ যায় দূরে,
হেরিলে সৌন্দর্য্য যার হাসিত ভূতল
তার কেন অশ্রু ঝরে,—বল মোরে বল!

২

সোণার প্রতিমা কেন ফেলে অশ্রুজল!
(যার) ফুটন্ত পদ্মের মত,
আঁখি দুটী উজলিত,
স্বর্গীয় অমিয়-মাখা যে মুখ কমল,
কেন তার অশ্রু ঝরে বল মোরে বল?

৩

স্বর্ণ-প্রতিমার চোখে কেন দেখি জল!
যে মুখ হাসিতে ভরা
হাসিতে ভুলা'ত ধরা,
কভুতো হেরিনি তার অশ্রুভরা জল!
আজ তবে হিরণ্ময়ী কেন কাঁদে বল?

৪

(আজি) স্বর্ণ-প্রতিমার চোখে কেন দেখি জল?
যাহার সুন্দর কান্তি
হেরিলে ঘটিত ভ্রান্তি—
দেবী কি মানবী! মন হ'তো টলমল!
হিরণ্ময়ী কেন কাঁদে বল মোরে বল?

৫

আজি মোরে বল তোরা একবার বল—
তার সেই মুখ স্মরি
আর যে থাকিতে নারি,
হ'তেছে শতধা চূর্ণ মোর হৃদিতল—
সে কেন বিষণ্নমনা বল মোরে বল!

৬

আমি কি ভ্রমেতে পড়ি হেরিতেছি ভুল?
না-না, সেতো একমনে
বসে, দেখি নিরজনে
নীরবে নিশীথে ধীরে ঢালে অশ্রুজল!
আমার তো ভ্রম নহে, কি হয়েছে বল।

৭

(অয়ি) স্বর্ণপ্রতিমা! কেন ভাস অশ্রুজলে?
বুঝেছি বুঝেছি সতী,
তোর যে দেবতা পতি
কাঁদায়ে গিয়াছে বুঝি,—নাই ধরাতলে।
তাই কিগো হিরণ্ময়ি ভাস অশ্রুজলে?

৮

(হায়) কে মোরে হানিল আজি এ নিঠুর বাণ?
যে শুনা'ল এই বাণী,
(তার) কিবা প্রাণ নাহি আনি—
এ নিঠুর বাণী কেন শুনিলিরে কাণ!

* কোন সুন্দরী পরিচিতা বাল-বিধবা-দর্শনে লিখিত।

শুনিবার আগে কেন তাজিলে না প্রাণ ?

৯

(হায়,) বিধাতা কি তোর ভালে এই লিখে ছিল ?
(কত) আদরের আদরিণী
(করে) রেখেছিল শ্বশ্রূরাণী,
বধূরূপে ছিলে তাঁর ঘর করি আলো।
কেন এ সুখের মাঝে অনল জ্বলিল ?

১০

(তাই) মোর সাথে আলাপন করেছিলে বলে,
তাই কি এমন আজি ঘটিল কপালে ?
(হায়) অভাগা যথায় যায়
সাগর (ও) শুকায়ে যায়,—
তাই বুঝি মোর স্পর্শে, কমল মুকুলে
ফুটিতে না ফুটিতেই অকালে শুকালে ?

১১

(আজি) আয়রে ভগিনী তোরে হৃদে ধরি আয়,—
কি ব্যথা পেয়েছ আজি জানাবে তা কায় ?
(এ) অসহ্য বেদনা জ্বালা
কোথায় জুড়াবে বালা ?
সম-দুঃখী না হ'লে কে বুঝিবে বেদন ?
তাই বুঝি আজি মোর পুড়িতেছে প্রাণ ?

১২

আয়রে ভগিনি, আজি ধরি হৃদয়েতে,
তুমিও আমার মত দুঃখী এ জগতে।
কি ব'লে বোঝাব ভাই,
ক্ষমতা কি আছে ছাই,
(তবে) ধর্ম্মের পথেতে সদা রাখি প্রাণমন,
"দেবী হিরণ্ময়ী" নাম করিও ধারণ।

১৩

আমিতো সামান্য ভাই কিছুই জানিনে।
(তাই) যেখানে যে ভাবে থাকো,
তাঁহারে হৃদয়ে রেখো,
সংসারের পথে ভাই নানা প্রলোভনে
"ভুলনা" তাদের ডাকে সেই "ভগবানে।"
সবে তব চৌদ্দ বর্ষ,
(আছে) কত দুঃখ কত হর্ষ,
কঠিন পরীক্ষা মাঝে কত যে পড়িবে—
সে সবার মাঝে কভু "তাঁরে" না ভুলিবে।
(ভাই) দেখো করি তন্ন তন্ন,
সেই এক তিনি ভিন্ন,
সুখে দুখে চিরবন্ধু নাই অন্য জন,
(দেখ) তাঁহারে পূজিতে ভাই ভুলনা কখন।

তোমার সমদুঃখিনী ভগিনী

শ্রীপ্রি—

বর্ণমালানুসারে ১৩২১ সালের বামাবোধিনীর সূচী।

বামারচনা।

[illegible] নং মথুরার লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রী সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং অ্যান্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 613. September, 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১৩ সংখ্যা। { ভাদ্র, ১৩২১। সেপ্টেম্বর, ১৯১৪। } ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

নিবেদন।

এ জীবন কি শুধু একটী মহাসাগরের জলবুদ্‌বুদ্ মাত্র? মহাসাগরে যেমন কত শত সহস্র জলবুদ্‌বুদ্ উত্থিত হইয়া আবার তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে, তাহার যেমন কোন উদ্দেশ্য বুঝা যায় না এ জীবন কি সেইরূপ উদ্দেশ্যবিহীন জলবুদ্‌বুদ্ মাত্র? একবার উত্থিত হইয়া অলক্ষ্যে মিলাইয়া যাইবে? না, জগতের সমুদয় সৃষ্টবস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, এ জগতে বিধাতাপুরুষ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কণামাত্র বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয় নাই। প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টরূপে তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিলেও পরোক্ষভাবে তাহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারা যায়। মানবের শুভ সঙ্কল্প দ্বারা যাহা রচিত তাহা কল্যাণকর, ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট। এ জগতের সমুদয় বস্তুই আমাদের অজ্ঞাতসারে যাহা রাখিয়া যাইতেছে পরে তাহাই আমাদের জীবন গঠনের সহায় হইবে। এক কথায় বলিতে হইলে আমাদের প্রত্যেকের জীবনই এ জগৎবাসীর শিক্ষার বিষয়। আমরা সকলেই এক একজন শিক্ষকরূপে পরিগণিত। যে জীবন শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে কিরূপে উদ্দেশ্যবিহীন জল-বুদ্‌বুদের সঙ্গে তুলনা করিব? তাহাত হইতে পারে না। ইহা যখন উদ্দেশ্যবিহীন জল-বুদ্‌বুদ্ নহে তখন ইহার কর্ত্তব্য কত কঠিন। যে জীবনের উদ্দেশ্য আছে তাহার লক্ষ্যও আছে। সেই লক্ষ্যকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া সকল প্রকার পরীক্ষার মধ্য দিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য সাধন করাই জীবমাত্রের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইলে ধৈর্য্য, পবিত্রতা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। হে বিশ্ববিধাতা এ জীবন যখন উদ্দেশ্যবিহীন খেলার

সামগ্রী নহে তখন যাহাতে ইহা ইহার লক্ষ্য সাধনের উপযোগী হয় সেই সকল গুণ দ্বারা ইহার উন্নতির সহায়তা কর। পূর্ব্বজীবনে যাহা করিয়া আসিয়াছি তাহার মধ্যে যে সকল ত্রুটী ও অপরাধ আছে তাহার সংশোধন কর। "জীবন ক্রম-উন্নতশীল" শুনেছি, এ জীবনের পক্ষে সেই বাক্য যাহাতে সফল হয় সেই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার করুণা ব্যতীত জীব বাঁচিতে পারে না, এতদিন তোমার সেই অপার করুণা লাভ করিয়া আসিয়াছি। হে দেবাদিদেব মহাদেব আজিও তোমার সেই করুণার প্রার্থী হইয়া তোমার চরণে উপস্থিত হইয়াছি, আশীর্ব্বাদ কর।

"সবাই ছেড়েছে নাহি যার কেহ
তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন নাহি যার গেহ
সেও আছে তব ভবনে।"

হে প্রভু "সবাই যাকে ছেড়েছে তার তুমি আছ,যে নিরাশ্রয় তার জন্য তোমার গৃহ আছে" এই আশায় আশান্বিত হইয়া চলিতেছি. তুমি আমার সহায় হও।

তুমি আমার পিতা, রক্ষক পালয়িতা,
পদাশ্রয়ে করহ অভয়।
তুমি মম জননী,— স্নেহ প্রেমের খনি,
কোলে রাখ এ তনয়ায়।
তুমি আমার সখা, প্রাণ মাঝে দেও দেখা,
উদ্ধার বিপদ সময়।
তুমি আমার গুরু, মনোবাঞ্ছা কল্পতরু,
তব কৃপায় সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা নারী।

জন্মকালে সকল দেশের, সকল সময়ের ও সকল শ্রেণীর কন্যারা একই অবস্থায় থাকে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পর পিতা-মাতার অবস্থানুসারে ও দেশকাল ভেদে ক্রমশঃ তাহাদের জীবনের তারতম্য হইয়া থাকে। জঙ্গলে পতিত সাঁওতালের শিশু. উঠানে শায়িত দরিদ্রকন্যা, তেতলার উপরে দুগ্ধফেননিভশয্যাস্থিত ধনীর বালিকা, কিম্বা সুন্দর মখমলের শয্যায় বহুমূল্য পোষাকে আবৃত ইউরোপীয় ধনীর সদ্যঃ প্রসূত সন্তান—এ সব গুলিই মঙ্গলময় জগদীশ্বরের একই নিয়মে সৃষ্ট এবং একইরূপ আভ্যন্তরিক অবস্থায় স্থিত, উহাদের মধ্যে কিছুই প্রভেদ নাই। সকলেই ক্ষুধা পাইলে একভাবে কাঁদে এবং দুগ্ধপানে এক প্রকারেই পরিতৃপ্ত হয়। জননী যাহাই আহার করুন্ তাহা একই প্রণালীতে জীর্ণ হইয়া একই নিয়মানুসারে তাহাদের শরীর পুষ্ট করে। অবশ্য, উহাদের বাহ্যিক পরিচ্ছদ ও সজ্জার যে প্রভেদ তাহা দ্বারা উহাদের আভ্যন্তরিক অবস্থার হটাৎ কোন বিভিন্নতা ঘটাইতে পারে না।

শীতকালে তাহাদের জরিমখমলের বা বনাতের পোষাকে গা ঢাকা দাও, বা ভালুকের চামড়ায় আচ্ছাদন করিয়া রাখ, তাহারা উভয় হইতেই একইরূপ উপকার পায়। গ্রীষ্মকালে উহাদের খাটের উপর শীতল পাটীতে ফেলিয়া রাখ, বা মাঠের উপর নরম ঘাসে শোয়াইয়া দাও—তাহারা একই ভাবে হাত পা নাড়িয়া খেলা করে। কিন্তু ঐ সকল বালিকা যত বড় হইতে থাকিবে তত তাহাদের জীবন ও শরীরের প্রভেদ লক্ষিত হইবে। ইহা সত্য যে, ধনী বা দরিদ্র, মূর্খ বা শিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকের সন্তানেরই অনিয়মের ফলে অসুখ হইয়া থাকে, আবার এক ঔষধ ও জননীর শুশ্রূষায় সকল শিশুই আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু অধিকাংশ দরিদ্রসন্তান উপযুক্ত ঔষধও পায় না আর মারও সেরূপ যত্নও পায় না। পিতামাতা দরিদ্র, ঔষধ কিনিবার অর্থ নাই, অথবা তাহারা এত অসভ্য যে ভিন্ন ভিন্ন রোগের যে স্বতন্ত্র ঔষধ ব্যবস্থা আছে সে জ্ঞানও তাহাদের নাই। অথচ দরিদ্র বা অসভ্য মায়েদের মনে যে মাতৃস্নেহ কম তাহা নহে, কেবল শিক্ষার অভাবে তাহারা উপযুক্তরূপে সন্তানপালনে অক্ষম। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া ধনীর কন্যাটী এক দিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া মার যত্নে ও দাস দাসীর কোলে কোমলভাবে পালিত হয়, অপরদিকে অসভ্য বা দরিদ্রের মেয়েটী মাটীতে কাদা-ধূলা মাখিয়া বাড়িতে থাকে।

এখন আমরা লক্ষ করিলে দেখিতে পাইব, দুটি কোমল ফুল একত্র একভাবে ফুটিয়া যত্ন ও কর্ষণ প্রভাবে একটী বাগানের গোলাপ হয়, আর অবহেলা ও অশ্রদ্ধা বশতঃ অন্যটী বনের ভাঁট-বাকসের মত গড়াগড়ি যায়। এখন হইতেই আমরা তাহাদের বাহ্যিক প্রভেদের সঙ্গে মানসিক বিভিন্নতার চিহ্ন দেখিতে পাই। বড় মানুষের বা সভ্যলোকের মেয়েরা কাদায় হাত দিতে সংকুচিত হয়, দরিদ্র বা অসভ্য শিশুরা কাদা ধূলা মাখিয়া সুখী হয়। একটী বালিকা কাপড় না পরিয়া কখন ঘরের বাহিরে যাইবে না, আর একটী খোলা দেহে রাস্তায় ছুটিয়া বেড়ায়। ক্রমশঃ একজন নানারূপ বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া জ্ঞানবতী হয়, অপরটী নিজের অবস্থা পর্য্যন্ত উপযুক্তরূপে না বুঝিয়া পশুর মত জীবন কাটায়। অতএব দেখ, ঐ দুটী জীবনে কত প্রভেদ। বাহ্যিক বিভিন্নতা হইতেই উহাদের এই আভ্যন্তরিক অনৈক্য। অথচ জন্মাইবার পর হইতেই যদি আমরা ঐ দুটী মেয়েকে একভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া লালন পালন করিতাম, একভাবে শিক্ষা দিতাম, তাহা হইলে ঐ দুইটীই যে এক প্রকার পবিত্র, শিক্ষিতা ও চতুর হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইহাতেই আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, মানব জীবনে, বিশেষতঃ নারীর পক্ষে শিক্ষার কত আবশ্যক। আমাদের দেশে অল্প বয়সেই মেয়েদের বিবাহ হইয়া